একবিংশ শতাব্দীর কিছু প্রযুক্তিচিত্র

বিশ্বভুবনে আমি কোথায়

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

মোবাইল ফোন আকারের ছোট্ট জিপিএস যন্ত্রটি থাকলেই এই বিশাল পৃথিবীতে হারিয়ে যাওয়ার কোন উপায় আমার নেই। প্রতি মুহূর্তে ঐ জিনিসটির দিকে তাকিয়েই বলতে পারবো ঠিক কোন জায়গায় আমি আছি। একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তির চালচিত্র এমনি সব নানা চমকপ্রদ জিনিসের ভিত্তিতেই দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এসব নানা দিক নিয়েই এই বই 'বিশ্বভুবনে আমি কোথায়'। এসব প্রযুক্তি ধারার কোন কোনটি ইতোমধ্যেই দুনিয়াকে বেশ জমিয়ে তুলেছে। অন্যগুলো এখনো ভবিষ্যতের হাতছানিই দিচ্ছে। শতাব্দী যত এগুবে এসব প্রযুক্তিসহ সীমান্তবর্তী আরো অনেকগুলোর চমকপ্রদ সব উন্নয়ন আমরা দেখতে পাবো। এটি সুনিশ্চিত যে আমাদের জীবন যাপন ও মননকে এরা অনিবার্যভাবে বদলে দিতে যাচ্ছে।

ISBN : 984 410 503 X

বিশ্বভুবনে আমি কোথায়

বিশ্বভুবনে আমি কোথায়

একবিংশ শতাব্দীর কিছু প্রযুক্তি চিত্র

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সূচিপত্র

বিশ্ব ভুবনে আমি কোথায় ? ৯
একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ১৮
কৃত্রিম পোকা ২৫
কম্পিউটার, ফাইল থেকে চেয়ারটি প্রিন্ট
করে দিন্ তো, দেখি বসতে কেমন লাগে ৩১
বাড়ি চটপটে হচ্ছে এরপর জ্ঞানী হবে ৩৮
যেই সুর লক্ষ্যভেদী ৪৭
নতুন পরমাণু-যুগঃ ন্যানো ইলেকট্রনিক্স ৫৩
প্লাস্টিক আলো ৬০
ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ ব্যবস্থা: ফুয়েল সেল ৬৬
উপগ্রহ ছাড়াই দূরে ইমেজ প্রেরণ ৭১
ক্ষুদ্র পাখা: মাইক্রোফ্যান ৭৩
বিজ্ঞান চর্চায় অধিক মানুষের অংশগ্রহণ
একুশ শতকের একটি সম্ভাবনা ৭৫
যৌথ গবেষণার কোল্যাবোরেটরী ৮০
আণবিক আকারের কলকব্জা ৮৫
যে সফ্টওয়্যার নিজেই গজাবে ৯৩
কাগজ কলমে তথ্য প্রযুক্তি ১০০
ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়: উচ্চ শিক্ষা আমূল পাল্টে দেবে ১০৬

ভূমিকা

মোবাইল ফোন আকারের একটি ছোট্ট যন্ত্রের সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে পুরো পৃথিবীর মধ্যে আমার এখনকার অবস্থানটি আমি নিঁখুত ভাবে জেনে নিতে পারি, অন্যকেও জানাতে পারি। এর কয়েক মিটার এদিক বা ওদিক গেলে, কিংবা উপরে নিচে কয়েক মিটার উঠলে বা নামলে আমার অবস্থানের পরিবর্তনটিও তাতে ধরা পড়বে। এই যে আমি এত বড় পৃথিবীতে হারিয়ে যেতে পারছিনা তা ছোট যন্ত্রটির বদৌলতে হলেও এর পেছনে কাজ করছে বিশ্ব-জোড়া একটি প্রযুক্তি– গ্লোবাল পজিশনিং সিষ্টেম, সংক্ষেপে জি পি এস। এটিই এই বইয়ের প্রথম প্রবন্ধ 'বিশ্বভূবনে আমি কোথায়' এর বিষয়বস্তু। এমনি কিছু সীমান্তবর্তী প্রযুক্তি নিয়েই অবতারণা করা হয়েছে বইয়ের বাকি লেখাগুলোও। সীমান্তের সব কিছুই যে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা মোটেই নয়। তবে এর বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র রয়েছে বৈ কি। স্বাভাবিক ভাবেই তথ্য প্রযুক্তির কথা বেশি এসেছে– থ্রি-ডি প্রিন্টিং এর মাধ্যমে কম্পিউটারে ডিজাইন করা বস্তুটি জলজ্যান্ত বের করে আনা, নিজেই নিজেকে লেখার যোগ্যতা সম্পন্ন সফ্টওয়্যার, মনিটর ও কী-বোর্ডের পরিবর্তে সনাতন ঢঙে কাগজ-কলমে তথ্যপ্রযুক্তি, ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার চেহারা পালটিয়ে দেয়া– ইত্যাদি। কিন্তু নানা ভিন্ন দিক থেকেও যে যুগান্তর ঘটে যাচ্ছে প্রযুক্তির– তারও কিছু কিছু অবতারণা রয়েছে এতে। জীবন-রহস্যকে আমরা যে বুঝতে শুরু করেছি তা শুধু বুঝার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছেনা, জীব জগতের অনুকৃতিতে আমাদের গড়া অজৈব জগতকে কিছু জৈব মাত্রা দেয়ার যে আয়োজন, তা আছে 'কৃত্রিম পোকা' প্রবন্ধে। নূতন ইলেকট্রনিক্স প্লাষ্টিক আলো ছড়িয়ে অনেকটা বেশি ফ্যাশন-দুরস্ত হয়ে উঠছে। আর ন্যানো ইলেকট্রনিক্স

হাতছানি দিচ্ছে অন্য এক রকমের একটি পরমাণুযুগের। সেই ন্যানো পর্যায়ের ক্ষুদ্র জগতে নানা রকম মেশিনও তৈরি হতে যাচ্ছে অতি অতি ক্ষুদ্র আকারে। বড় মেশিনের মতই এগুলো ঘুরবে, ফিরবে, কাটবে– কিন্তু হয়তো আমাদের রক্ত নালির মধ্য দিয়ে শরীরের কোষে গিয়েই করতে পারবে এসব কাজ। এই সব এখন আর কল্প-কাহিনী নয়, কারণ এর প্রযুক্তির বাস্তব আয়োজন চলছে, এখন– এই সময়।

একবিংশ শতাব্দী যতই এগুবে, এসব প্রযুক্তিসহ সীমান্তবর্তী আরো অনেকগুলোর চমকপ্রদ সব উন্নয়ন আমরা দেখতে পাবো। শতাব্দীটির যে ক'টি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে সেগুলোতেই আমরা প্রস্ফুটিত হতে দেখছি এমনি শত সম্ভাবনা। এখানে বিচ্ছিন্নভাবে যে কয়েকটি প্রযুক্তির কথা আনা গেল তার কিছু কিছু ইতোমধ্যে আমাদের জীবনে ফলপ্রসূ হয়েছে। বাকি কিছুর পূর্ণ রূপায়ন দেখতে আরো কিছু সময় নেবে। কিন্তু সব মিলে দুনিয়ার সব মানুষের জীবন যাপন ও মননকে এরা অনিবার্যভাবে বদলে দিতে যাচ্ছে। প্রযুক্তির সীমান্ত প্রদেশে এরকম ইতস্তত হালকা পদচারণা, এ বইয়ে যার চেষ্টা আছে, তার একটি মানে তাই দাঁড়াতে পারে বৈকি।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ২০০৬

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

বিশ্বভুবনে আমি কোথায়?

এই বিশ্বে কোথায় আমার অবস্থান? না, এ প্রশ্নটি দার্শনিক অর্থে করা হলো না, হলো একেবারেই বাস্তব অর্থে, কারণ এর বাস্তব উত্তরটা এখন যে কোন মানুষের হাতের মুঠোয়। মোবাইল ফোনের মত ছোট্ট একটি যন্ত্রকে পকেট থেকে বের করে হাতের মুঠোয় নিলেই হলো।

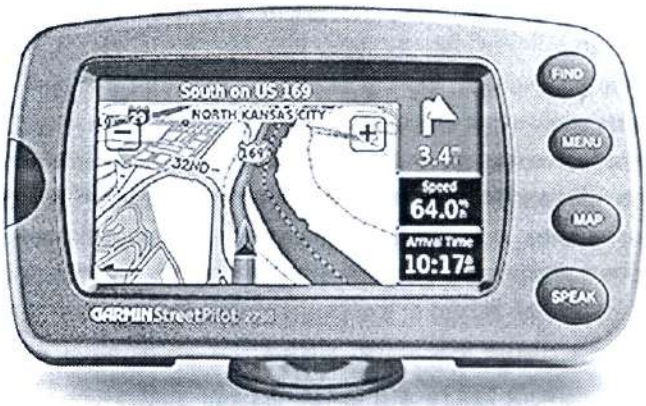

এর দিকে তাকিয়েই বলা যাবে এই বিশাল দুনিয়ায় কোন্ বিশ মিটার জায়গার উপর আমি দাঁড়িয়ে আছি। উত্তরটা আসবে সেই সনাতন অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশের ভাষায়– তবে একেবারে সূক্ষ্ম খুঁটিনাটিতে ডিগ্রি, মিনিট, সেকেণ্ড ধরে অক্ষাংশ, আর তেমনি দ্রাঘিমাংশ। মনে করুন আমি আছি ঢাকার ঠিক জিরো পয়েন্টের কাছে- ঠিক ঐ জায়গাটিরই অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ পাব। তাছাড়া সমুদ্র

সমতল থেকে সে জায়গার উচ্চতাটুকুও পাব। ধরা যাক আমি হেঁটে এগিয়ে গিয়ে বায়তুল মোকাররাম মসজিদের সিড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। যন্ত্রটিতে পরিষ্কার দেখতে পাব আমার অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, উচ্চতা সবই খানিকটা বদলে গেল যার থেকে সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারবো ঠিক কোন দিকে কতখানি হাঁটলাম এই মাত্র। আমার এই যন্ত্রে যে অবস্থানের যে তথ্যগুলো পেলাম তা সারা দুনিয়ার মধ্যে শুধু ঢাকার জিরো পয়েন্টে বা বায়তুল মোকাররামের উপরের শুধু ঐ খানটিরই এই তথ্য, অন্য কোন জায়গার সঙ্গে এটি মিলবেনা। এভাবে বিশ্ব ভুবনে আমার প্রতি মুহূর্তের ঠাঁই এ যন্ত্র কয়েক মিটারের মধ্যে সুনির্দিষ্ট করে দিচ্ছে।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই আঁচ করতে পেরেছেন কী সোনার খনি আমি পেয়ে গিয়েছি। যে জায়গায় আমি যেতে চাই তার ঐ স্থানাংকগুলো থাকলেই হলো সূক্ষ্ম অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ এবং উচ্চতা। সেটি মীরপুর এক নম্বর সেকশনে হলে যা, আফ্রিকার জঙ্গলে হলেও তা, এমনকি এভারেস্টের চূড়ায় হলেও। ঐ যন্ত্রই আমাকে গাইড করে ঠিক সেই জায়গায় নিয়ে যাবে একেবারে কয়েক মিটারের মধ্যে সুনির্দিষ্ট করে। এর মধ্যে কখনো এটি আমাকে হারিয়ে যেতে দেবেনা, কখনো ঠিকানাবিহীন হতে দেবেনা। প্রতি মুহূর্তে আমাকে জানিয়ে দিয়ে রাখবে কোথায় আছি, কোন দিকে কতখানি গিয়েছি, বাকি কতখানি যেতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই এ যন্ত্র খুঁজে পেয়েছে অনেকগুলো গুরুতপূর্ণ ব্যবহার, আর বদলে দেয়ার প্রতিশ্রুতি রাখছে অনেক বিভিন্ন মুখি ক্ষেত্রকে।

আমরা যে প্রত্যেকে এখন পুরাপুরি বিশ্বায়িত, পুরো দুনিয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই যে নিজকে সব সময় দেখতে হচ্ছে এই যন্ত্র যেন তারই মূর্তিমান প্রমাণ। যন্ত্রটি আমার হাতের মুঠোয় হলেও অবশ্য একে কাজ করতে হয় পৃথিবীর বাইরে থেকে পৃথিবীকে পরিক্রমণশীল ২৪টি বিশেষ উপগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে। এর থেকে কাজ পেতে হলে আমার মুঠোর যন্ত্রকে এই উপগ্রহগুলোর অন্তত তিন চারটার সঙ্গে একই সাথে যুক্ত হতে হবে। এই ব্যাপক ব্যবস্থাটির নাম হলো গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (বিশ্ব-জোড়া অবস্থান-নির্ণয় ব্যবস্থা), সংক্ষেপে জিপিএস।

দেখা যাক, জিপিএস কিভাবে কাজ করছে। এর জন্য ২৪টি উপগ্রহ পৃথিবীর প্রায় ২৪ হাজার কিলোমিটার উপরে থেকে নিত্য একে পরিক্রমণ করে চলেছে। এর প্রত্যেকটিতে রয়েছে অতি সূক্ষ্মভাবে সময় রাখতে সক্ষম এটমিক ঘড়ি- যা সূক্ষ্মতম সময় রাখার যন্ত্রের অন্যতম। এই এটমিক ঘড়িগুলো আবার সমলয়ে রয়েছে আমেরিকার কলরাডোতে অবস্থিত জিপিএস কন্ট্রোল সেন্টারের সঙ্গে। এই উপগ্রহগুলোর প্রত্যেকটি কিছু বিশেষ রেডিয়ো সিগন্যাল পাঠাচ্ছে খুবই সামান্য

সময় পর পর। এই সিগন্যালের মধ্যে দেয়া থাকে উপগ্রহ থেকে এর যাত্রার সঠিক সূক্ষ্ম সময় আর ঠিক ঐ মুহূর্তে উপগ্রহটির একেবারে সঠিক অবস্থান। আমি যখন

পকেট থেকে আমার জিপিএস রিসিভার যন্ত্রটি বের করে হাতের মুঠোয় নিয়ে তা অন্ করেছি, তখনই ওটি ঐ ২৪টি উপগ্রহের কোন কোনটি থেকে পাঠানো সিগন্যাল গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে। কোন বিশেষ সিগন্যাল ঠিক কোন মুহূর্তে আমার মুঠোর যন্ত্রে এসে পৌছল তা যাত্রা সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে এটি হিসেব করতে পারে সিগন্যালটির এই দূরত্ব অতিক্রম করতে কতক্ষণ লেগেছে। সিগন্যালের গতিবেগ যেহেতু জানা রয়েছে ফলে এই সময় থেকে এবং পাঠাবার সময় উপগ্রহটির অবস্থান থেকে নির্ভুলভাবে হিসেব করে বলা যাবে আমি ঐ পয়েন্ট থেকে কতদূরে আছি এবং কোন দিকে আছি। এভাবে যদি মহাশূন্যে অন্ত ত তিনটি পয়েন্ট থেকে আমার দূরত্ব ও দিক আমি জানতে পারি তা হলে সাধারণ জ্যামিতিক হিসাব থেকেই (জরীপকারীরা যেভাবে করে থাকেন) আমার অবস্থান নির্ণয় করে দেয়া যায়। এসব হিসাব নিকাশ ও নির্ণয়ের ব্যবস্থা আমার হাতের ছোট্ট যন্ত্রটিতেই করে দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে বলেই অন্তত তিনটি উপগ্রহের সঙ্গে আমার সংযোগ স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের অবস্থান নির্ভুলভাবে আমি জেনে যেতে পারি।

অন্য আরো বেশ কিছু আবিষ্কারের মত জিপিএস এর সৃষ্টি হয়েছিল সামরিক প্রয়োজনে এবং পরে তা বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত

হয়েছে। ১৯৭৮ সালে মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর সৈন্য বাহিনীর নেভিগেশন্যাল ও লক্ষ্যভেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য এটি সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত এর সার্বজনীনতা বাড়তে বাড়তে এখন একশ' ডলারেরও কম দামে আপনি একটি মুঠোয় রাখা ব্যক্তিগত জিপিএস যন্ত্রের মালিক হতে পারেন। অবশ্য এর আর একটু বড় ও জটিলতর রূপটি বহু রকমের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনে সরাসরি ব্যবহার করা যাচ্ছে। জাহাজ ও বিমান চলাচলে নেভিগেশনে পুরানো পদ্ধতিগুলোর আজ আর তেমন প্রয়োজনই হচ্ছে না, জিপিএস এসে যাওয়াতে। উন্নত শহরগুলোতে ট্যাক্সীতে জিপিএস সংযোগ এখন অহরহ দেখা যাচ্ছে। সেখানে জিপিএস রিসিভারের সঙ্গে শহরের একটি বিস্তারিত ম্যাপ একীভূত করা রয়েছে। যেই রাস্তায় যেই বাড়ীতে আপনি যেতে চান সেটি নির্দিষ্ট করে দিলে তার জিপিএস অবস্থান চিহ্নিত হয়ে যাবে। এর পর থেকে ঐ যন্ত্রই চালককে দেখিয়ে দিতে থাকবে কোন রাস্তায় গিয়ে, কোথায় কোন মোড় নিয়ে ঐ ঠিকানায় সহজে পৌঁছানো যাবে। অবশ্য ঐ শহরের নিজের পরিস্থিতি যেমন কোন রাস্তা ওয়ান-ওয়ে, কোথায় জ্যাম বেশি হয়– ইত্যাদিও যেহেতু ম্যাপের জানা থাকবে জিপিএস পথ দেখাবার সময় ঐ বিষয়গুলো মনে রেখেই তা করবে।

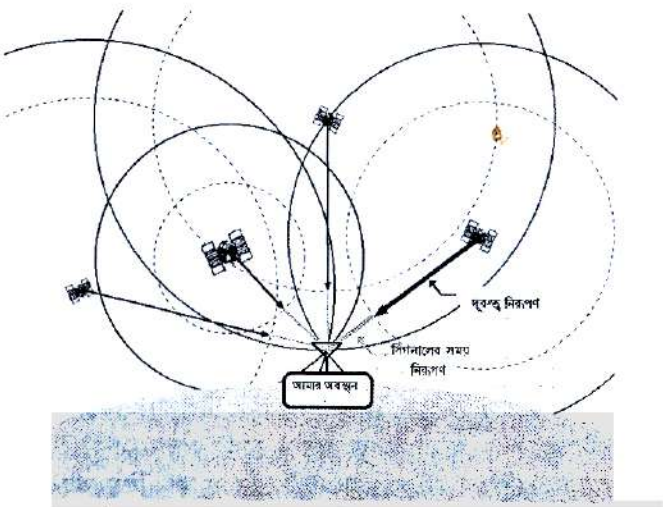

জিপিএস এর বর্তমান ও ভবিষ্যত ব্যবহারগুলো খুবই প্রাতিষ্ঠানিক থেকে খুবই ব্যক্তিগত– এই বিরাট বিস্তার জুড়েই থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মূল যেই উদ্দেশ্যে জিপিএস স্থাপন করা হয়েছিল সেই বিষয়টিকে এখন অত্যন্ত সূক্ষ্ম পর্যায়ে

নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখনো জিপিএস নিয়ন্ত্রণকারীদের কাছে সামরিক দিকটাই মুখ্য। হাজার মাইল দূর থেকে নিক্ষেপিত ক্রুজ মিসাইল যেভাবে এই পথ পাড়ি দিয়ে বিশেষ সামরিক স্থাপনাকে, এমনকি বিশেষ জায়গার বিশেষ বাড়িকে আঘাত করতে পারে তা এই জিপিএস এরই কারসাজি। আসলে জিপিএস এর মধ্যে সামরিক প্রাধান্যটি বজায় রাখার জন্য এর উপগ্রহ থেকে যে সিগন্যাল পাঠানো হয় তাতে দুটি ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড থাকে। এর মধ্যে একটিই শুধু সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত– যাতে ২০ মিটার পর্যন্ত দূরত্বের মধ্যে অবস্থান নির্ণয় করা যায়। অন্য ফ্রিকোয়েন্সি ব্যাণ্ডে গোপন ফোনের মাধ্যমে সামরিক সিগন্যাল পাঠানো হয় যা শুধু ঐ সামরিক কর্তৃপক্ষই ব্যবহার করতে পারে এবং দুই এক মিটারের মধ্যেই কোন কিছুর অবস্থান নির্ভুলভাবে নির্ণয় করতে পারে। অন্যদের কিন্তু এত সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করার সুযোগ নাই। আমরা শুধু পারি ২০ মিটারের মধ্যে।

আবার এর অতি সাধারণ ব্যবহারগুলোও উপেক্ষা করার মত নয়। হেঁটে বা সাইকেলে দেশভ্রমণে বের হয়েছেন এমন পথিকরাও এখন জিপিএস ব্যবহার করেন। পর্বতারোহীদেরতো এটি ছাড়া আর চলছেইনা। ছোট বিমানের পাইলট বিপদে পড়লে যে কোন সুবিধামত রানওয়েতে নেমে পড়ার চেষ্টা করতে পারেন কারণ তাঁর জিপিএস তাঁকে বলে দিতে পারে এ সময় তিনি কোন রানওয়ের কত কাছে রয়েছেন। যে কোন ধরনের বিপদ সংকেত দিতে এখন জিপিএস অবস্থান জানতে পারলে উদ্ধারকারীর আসতে খুব সুবিধা হয়ে যায়– কারণ জিপিএস তাঁদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতে পারবে। কেউ বিজন জায়গায় দুর্ঘটনায় পড়লে জিপিএস আর মোবাইল ফোন সঙ্গে থাকলে আর কোন চিন্তা নেই। আসলে ভবিষ্যতে জি পি এস এর ব্যাপক ব্যবহারের সম্ভাবনা বেশি এসব দিক থেকেই।

মোবাইল ফোনের সঙ্গে জিপিএস-এর সংযুক্তি খুবই আকর্ষণীয় ব্যাপার হতে পারে। এদের সেটের অনেকখানি যন্ত্রাংশ উভয়ের প্রয়োজন বলে একত্রিককরনে খরচ আরো কমে যাবে। ধারণা করা হচ্ছে যে ২০০৬ সাল নাগাদ গিয়ে দুনিয়ার তিন চতুর্থাংশ মোবাইলে জিপিএস থাকবে। এমন একটি ব্যবস্থা তখন থাকবে যে আমি যদি অজানা জায়গায় বিপদে পড়ি শুধু ঐ ফোনটিতে একটি নম্বর টিপে দেব। তখন থেকে মোবাইল ফোনের 'বাঁচাও' সিগন্যাল ক্রমাগত চারিদিকে সম্প্রচারিত হতে থাকবে পুলিশ, দমকল ও অন্যান্য উদ্ধারকারীদল সবাই এটা পাবে এবং জিপিএস এর কারণে এই সিগন্যালের মধ্যে থাকা উদ্ধারকারীদের সহজেই এগিয়ে আনতে পারবে। বর্তমানে মোবাইল ফোনে ফোনটি কোথা থেকে কাজ করছে তা জানার একটি পদ্ধতি আছে যা হলো সেল আইডি। এতে শুধু

ফোনের নেটওয়ার্কে কোন সেলে ফোনটি রয়েছে তাই শুধু জানা যায়- যা দশ কিলোমিটার কী তার কাছাকাছি দূরত্বের মধ্যে ফোনটির অবস্থান সনাক্ত করতে পারে। উদ্ধারকারীদের জন্য এটি যথেষ্ট নয়।

ট্যাক্সীতে জিপিএস এর ব্যবহার আমরা দেখেছি। ইউরোপের কয়েকটি শহরে– যেসব হেলসিংকি ও জেনোয়ার বাস, ট্রাম, ট্রেন ইত্যাদির চলাচল সম্পর্কে খোঁজ রাখার জন্য জিপিএস ব্যবহৃত হচ্ছে। এর থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে অপেক্ষমানরা বুঝতে পারেন বাস বা ট্রেন কখন তাদের কাছে পৌঁছবে। এতে সময়ের সাশ্রয় হয়, দক্ষতা বাড়ে। আরো ব্যক্তিগতভাবে জিপিএস এর ব্যবহার আসছে নিজের গাড়ি চালিয়ে বা হেঁটে কোন ঠিকানায় যাবার কাজে। বিভিন্ন রেষ্টুরেন্ট, দোকান এসব সম্ভাব্য ক্রেতাদেরকে মোবাইল/জিপিএস ফোনে নিজেদের জিপিএস অবস্থান দিয়ে রাখবে, যাতে তাঁরা ইচ্ছে করলেই সহজে এখানে চলে যেতে পারেন। এসব কারণে এর ব্যাপক একটি বাণিজ্যিক দিকও আশা করা হচ্ছে।

সবচেয়ে বড় কথা হলো ভবিষ্যতে বহু উন্নত দেশই চাইবে তাদের পরিবহন ব্যবস্থাকে জিপিএস-এর উপর ভিত্তি করে সাজাতে। এর মাধ্যমে যেমন সব গাড়ীকে জিপিএস সমন্বিত করে কর্তৃপক্ষ কোন গাড়ী টোল-রোড ব্যবহার করছে, শহরের ট্যাক্স-করা কেন্দ্রীয় অংশে যাচ্ছে তার হিসাব রেখে তাকে বিল করতে পারবে। আবার স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ীকে যখন যেখানে রয়েছে সেখানকার গতিসীমার মধ্যেও ধরে রাখতে পারবে। এসব করার জন্য বর্তমানে যে অত্যন্ত ব্যয়বহুল জটিল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে তা তখন দরকার হবে না। উপগ্রহ ব্যবস্থা তো ইতোমধ্যেই রয়েছে, শুধু গাড়িতে জিপিএস লাগিয়ে দিলেই হলো।

কিন্তু এত সব বড় পরিকল্পনা করতে গিয়ে একটি আশঙ্কা কিন্তু অনেকের মাথার উপর ঝুলছে- তা হলো পুরো জিপিএস ব্যবস্থাটির মালিক মার্কিন সামরিক দফতর। যে কোন সময় তারা মনে করতে পারে জিপিএস এর সার্বজনীনতা তাদের কাজের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। তখন তারা এর নির্ভুলতার পরিমাণ কমিয়ে দিতে পারে, এমনকি অন্যদের জন্য এটি বন্ধও করে দিতে পারে। বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের উপর এত বড় নির্ভরশীলতার কারণে কুটনৈতিক অসুবিধায় থাকতে চাচ্ছে না।

এ ছাড়া বর্তমান জিপিএস এর কিছু কিছু কারিগরি অসুবিধাও রয়ে গেছে। এতে উপগ্রহ থেকে যেই সিগন্যাল পাঠানো হয় তা খুব দুর্বল। এতটা পথ এসে এটি যখন জিপিএস রিসিভারে এসে পৌঁছে তাতে এখন কয়েক মাইক্রোওয়াটের মত শক্তির বেশি থাকেনা। আশপাশের রেডিয়ো সিগন্যালগুলোর তুলনায় দুর্বল

হওয়াতে এতে সহজেই বাধা আসতে পারে- যা ইচ্ছা করেও করা যায়, আবার ঘটনাক্রমেও হতে পারে। বিমান চলাচলের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নেভিগেশনের জন্য বর্তমানে ব্যবহৃত রেডিয়ো বীকন নেটওয়ার্ক তুলে দিয়ে শুধু জিপিএস-এর উপর নির্ভর করতে গিয়ে এ বিষয়টি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। অতীতে এরকম ঘটনা দু'একবার ঘটছে। যেমন কখনো বিমান থেকে জিপিএস সিগন্যাল বেশ কিছুক্ষণ পাওয়া যায়নি। উপগ্রহে যোগাযোগের জন্যও এমনটি হয়েছে।

নগরীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশে এরকম দুর্ঘটনা আরো অনেক বেশি ঘটে উচুঁ উচুঁ দালান ইত্যাদি থেকে সিগন্যাল প্রতিহত হওয়া বা প্রতিফলিত হওয়ার কারণে। যে পদ্ধতিতে জিপিএস অবস্থান নির্ণয় করে তাতে এর রিসিভার যন্ত্রকে অন্তত তিনটি উপগ্রহের সঙ্গে সরাসরি বাধাহীন সরল রেখার যোগাযোগ থাকতে হবে। আসলে অন্তত চারটির সঙ্গেই থাকলেই ভাল। অবশ্য আরো নির্ভুল নির্ণয়ের জন্য যত অধিক সংখ্যক উপগ্রহের সঙ্গে এই যোগাযোগ থাকে ততই ভাল। এজন্য করে আরো কয়েকটি উপগ্রহ রিসিভারের লাইনে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে অবস্থান নির্ণয় আরো নিখুঁত হয়। চারিদিকে উচুঁ দালানে পরিবেষ্টিত অবস্থায় এটি হওয়া কঠিন। তার উপর রিসিভারটি যদি গাড়িতে চলন্ত অবস্থায় থাকে তা হলেতো অন্তরায়গুলো আরো বড় হয়ে দাঁড়ায়। খোলা যায়গায় যেই নিখুঁত অবস্থান নির্ণয় সম্ভব নগরীর সরু রাস্তায় সেটি মোটেই পাওয়া যায়না। ইউরোপের রাস্তাঘাট অপেক্ষাকৃত কম প্রশস্ত বলে উন্নত দেশের মধ্যে সমস্যা সেখানেই বেশি হচ্ছে।

ভবিষ্যতে জিপিএস ব্যবস্থায় আরো উন্নয়নের কিছু পরিকল্পনা রয়েছে এর মার্কিন কর্তৃপক্ষের। কিছু বাড়তি উপগ্রহ ও কিছু গ্রাউণ্ড ষ্টেশন ব্যবহার করে জিপিএস সিগন্যালকে এতে পুন:শক্তিশালী করা হবে। বছর দশেকের মধ্যে এটি করা হলে সাধারণ জিপিএসএও সামরিক জিপিএস এর মত নিখুঁত ও নিশ্চিত অবস্থান নির্ণয় সম্ভব হবে।

তবে এর উপর নির্ভর না করে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ঠিক করেছে এই জোট তাদের নিজস্ব জিপিএস উপগ্রহ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে- এর নাম হবে গ্যালিলিও। ২০০৮ সাল নাগাদ সেটিও কাজ করতে শুরু করবে। গ্যালিলিও মূলত বর্তমান জিপিএস এর মতই একটি ব্যবস্থা হবে। বর্তমান ব্যবস্থার সুবিধা না পাওয়া গেলে এটি একইভাবে নিজেই কাজ করবে। কিন্তু আপাতত এটি মার্কিন জিপিএস এর সঙ্গে সম্মিলিতভাবেই তা করবে। গ্যালিলিওর নিজের থাকবে ৩৬টির মত উপগ্রহ। বর্তমানের ২৪টির সঙ্গে মিলে এখন যে কোন জিপিএস ৬০টি উপগ্রহের

সার্ভিস পাবে। এর ফলে বর্তমানে নগরীর কেন্দ্রগুলোতে যেখানে শতকরা ৫৫ভাগ জায়গায় জি পি এস কভারেজ পাওয়া যায় সেটি ৯৫ ভাগে উন্নীত হবে। তাছাড়া এর নিভুলতার পরিমাণও অনেক বেড়ে যাবে। তবে গ্যালিলিও ব্যবহৃত হবে বিশুদ্ধ বেসামরিক কাজে। এজন্য ৩.২ বিলিয়ন ইউরোর বাজেট নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

বর্তমান জিপিএস এর মালিক মার্কিন সরকার কিন্তু এ বিষয়ে খুব খুশি নয়। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মহল, বিশেষ করে প্রযুক্তিবিদমহল গ্যালিলিওর পরিকল্পনাকে জিপিএসকে আরো উন্নত করবে বলে স্বাগত জানিয়েছে, মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ কিন্তু ইউরোপীয় দেশগুলোকে জানিয়ে দিয়েছে যে গ্যালিলিও অপ্রয়োজনীয়। তার মতে জিপিএস ইতোমধ্যেই দুনিয়াব্যাপী চমৎকার সার্ভিস দিচ্ছে, আর সামনে এর নিজেরই যে উন্নয়ন পরিকল্পনা রয়েছে, তাতেই এর আপাত অসুবিধাগুলো দূর হয়ে যাবে। বরং গ্যালিলিও চালু হলে ওর ফ্রিকোয়েন্সি প্রস্তাবিত মার্কিন উন্নয়নগুলোতে ব্যবহৃত ফ্রিকোয়েন্সির এত কাছে হবে যে তাতে গোলযোগের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। তবে মনে হচ্ছে ইউরোপীয়রা এই আপত্তিকে মেনে নিচ্ছেনা। বরং বলছে যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ফ্রিকোয়েন্সি সংক্রান্ত ব্যাপারে সমঝোতায় পৌছানো সম্ভব হবে।

তবে অনেক বিশেষজ্ঞরা মার্কিন আপত্তির কারণ অন্যত্র বলে মনে করছেন। তাঁদের মতে অধিকাংশ আমেরিকান জিপিএস ব্যবহারকারী গ্যালিলিওকে পছন্দ করলেও, প্রতিরক্ষা বিভাগ পছন্দ করছেনা তার কারণ তাতে এক্ষেত্রে মার্কিন আধিপত্য নষ্ট হবে বলে। তাদের ভয়ও রয়েছে একচেটিয়া তাদের হাতে না থাকলে সম্ভাব্য শত্রুরা কোনদিন এটি সামাজিকভাবে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করতে পারবে। নিজের জিপিএস এর কাছাকাছি ফ্রিকোয়েন্সি হবে বলে একে নিজের ক্ষতি না করে জ্যাম করাও কঠিন হবে। বিশেষজ্ঞরা এ ছাড়া মার্কিন বাণিজ্যিক স্বার্থকেও গ্যালিলিও বন্ধ করার চেষ্টার পেছনে একটি কারণ মনে করে। সামনে এই প্রযুক্তিকে ঘিরে বহু বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা গড়ে উঠবে- এটিও একচেটিয়া রাখতে পারলে মার্কিন সরকার খুশি হবে।

তবে মার্কিন আপত্তি সত্ত্বেও গ্যালিলিওর পরিকল্পনা এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যেই সদস্য রাষ্ট্রগুলো এতে অর্থের বরাদ্দ দিয়েছে। ২০০৬ সাল নাগাদ এর উপগ্রহগুলোর উৎক্ষেপন শুরু হবে, সবকিছু ভালয় ভালয় কাটলে। পরবর্তীতে কিভাবে এই ব্যয় উঠে আসবে সেটি অবশ্য এখনো হয়নি। বর্তমানের জিপিএস এর মতই গ্যালিলিও সবাইকে নিখরচায় এটি ব্যবহার করতে দেবে- বরং আরো নিখুঁত আরো শক্তিশালী সিগন্যাল দিয়ে। আয়টি আসবে সাধারণ ব্যবহারকারীদের থেকে নয়, বরং বিশেষ ধরনের ব্যবহারকারী যাদের অনেক বেশি নিখুঁতভাবে

অবস্থান নির্ণয় করতে হবে তাদের থেকে। তাদের জন্য ভিন্ন বিশেষ পেয়িং সিগন্যালের ব্যবস্থা থাকবে। ওদের প্রত্যেকটি নির্ণয়ের নির্ভুলতা পরিমাপের ব্যবস্থাও গ্যালিলিও সিগন্যালের মধ্যে থাকবে যাতে উপগ্রহে বা অন্যত্র কোন গোলযোগ হলে ধরা পড়ে তারা পুরোপুরি নিশ্চয়তার সঙ্গে সংবেদনশীল কাজগুলো করতে পারে।

জিপিএস, গ্যালিলিও সবার জন্যই ভবিষ্যতের দিনগুলোতে প্রযুক্তিগত আরো বড় সমস্যা দেখা দিতে পারে অন্যান্য ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে রেডিয়ো ফ্রিকোয়েন্সির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে। এখনই ব্লুটুথ অর্থাৎ কম্পিউটার সমূহের মধ্যে রেডিয়ো তরঙ্গের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক স্থাপিত হবার প্রযুক্তি ব্যাপকতা লাভ করছে। সবকিছুর সঙ্গে সবকিছুর তার বিহীন রেডিয়ো যোগাযোগের প্রবণতা বেয়েই চলছে। দুর্বল কিন্তু খুবই প্রশস্ত ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড ক্রমেই ব্যাপকভাবে এরা ব্যবহার করবে। এতে জিপিএস প্রযুক্তিতে ইন্টারফেরেন্স সৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমেই বেড়ে চলবে। শেষ পর্যন্ত সবাইকেই সমঝোতার টেবিলে বসেই দেয়া নেয়ার মাধ্যমে সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হবে। জিপিএস, গ্যালিলিও, কম্পিউটারে ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কের প্রবক্তাগণ সবাইকে এই ফ্রিকোয়ন্সি-যুদ্ধে শরীক হতে হবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে। সব প্রযুক্তিরই গুরুত্ব রয়েছে, প্রত্যেককেই সর্বোচ্চ দক্ষতায় চলতে হবে এই নীতির উপর ভিত্তি করেই চলবে সমঝোতার জন্য এই বিতর্ক যুদ্ধ।

একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

'একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' এমন একটি শিরোনাম নিয়ে কিছু লেখার চেষ্টা করার জন্যই আমি প্রথমে ক্ষমাপ্রার্থী। বিজ্ঞানের বহু সোনা-ফলানো শাখার কোনটিরই বর্তমান সম্পর্কে আমার এমন কোন দখল নেই যার ভিত্তিতে আগামী দিনের কথা কিছু আন্দাজ করতে পারি। তবুও আর দশ জন আগ্রহী মানুষের মত দর্শক হিসাবে যা দেখছি, যা পড়ছি, তার ভিত্তিতে ভাবনাকে কিছু এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং আপনার চিন্তার সঙ্গে কৌতুহল ভরে তা মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করতে দোষ কি! মনীষীরা বলেন ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে। বিংশ শতাব্দীর দিকে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলে হয়তো একবিংশের ভাবভঙ্গী বুঝতে সহায়ক হবে। বিজ্ঞানীদের জন্য বিংশ শতাব্দীটা শুরুই হলো একটি বিপ্লব-দিয়ে–কোয়ান্টাম বিপ্লব। অনেকগুলো মৌলিক ধারণা ভেঙ্গে দিল এটি। কণিকা আর তরঙ্গের পৃথক সত্ত্বা রইলোনা। সকল অস্তিত্ব হয়ে পড়লো সম্ভাবনার ব্যাপার, নীতিগতভাবে বিজ্ঞানের পক্ষে সর্বাত্মক নিশ্চয়তা দাবি আর সম্ভব হলোনা। এসব ছাড় দেয়ার বিনিময়ে অবশ্য আমরা প্রচন্ড ক্ষমতার অধিকারী হলাম–বস্তুকে সর্বোতভাবে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা, তাকে সূক্ষ্ম কৌশলে কাজে লাগানোর ক্ষমতা, এমনকি বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের শুরুর মুহূর্তে কি ঘটেছিল, তার পরিণতিই বা কি হতে যাচ্ছে সেটি আন্দাজ করার ক্ষমতা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধেকটা আমরা কাটালাম এই অভূতপূর্ব ক্ষমতাকে সুসংহত করতে।

কোয়ান্টাম বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটেছিল বিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুর বছরটিতে। আর তার ঠিক মাঝামাঝি বছরের কাছাকাছি সময়ে ঘটলো আর একটি মহা-ক্ষমতা লাভ। ডি এন এর গঠন উদ্ঘাটিত হলো। যেই নীলনক্শা ধরে জীব সৃষ্টি ও

বিকশিত হয় সেটি এর ফলে মানুষের শুধু বুদ্ধির সীমার মধ্যে এলোনা, কর্মের সীমার মধ্যেও চলে এল। জিন কারিগরি জীবনের মৌলিক উপাদানের উপর হাত দিলো। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধেকটিতে আমাদের এই ক্ষমতা এতখানি বিকশিত হলো যে আজ আমরা তাকে নিয়ে সাহসী সব স্বপ্ন দেখতে পিছ পা হচ্ছি না।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দুটি দশকে এসে আরো কিছু ঘটনা ঘটলো যা একবিংশের উপর প্রচুর প্রভাব ফেলবে। এর একটি হলো সাধারণ যুক্তি বা লজিকের অনুসরণে অসংখ্য ছোট ছোট কাজের ধাপে জটিল কাজ করার ঝামেলাটি অনায়াসে কম্পিউটারের হাতে ছেড়ে দিতে পারা। এর সঙ্গে যোগ করে দেয়া গেল তথ্য বিনিময়ের জন্য টেলিযোগাযোগের বিস্তৃত জাল-এক দিকে একেবারেই ঘরোয়া, অন্যদিকে একেবারেই বিশ্বজনীন। ফলে বিশ্বের সবাই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবার এক অদ্ভুত সুযোগ এসে গেলো। কম্পিউটারভিত্তিক তথ্য প্রযুক্তি জীবনকে বদলাতে শুরু করলো, এবং বিজ্ঞানকেও। সেই যে ক্ষুদ্র বস্তুকে নিয়ে কোয়ান্টাম বিপ্লব ঘটেছিলো, এখন সেটি ক্ষুদ্রায়িত ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বায়নের ফসল ফলালো। প্রায় একই সঙ্গে মানুষ নিজের একটি মাত্র ঠাঁই আপন বিশ্বটি সম্পর্কে সচেতন হয়েছে - পরিবেশ রক্ষা ও বিশ্বকে টেকসই রাখার প্রবল আগ্রহ তার মধ্যে দেখা দিয়েছে। ধরিত্রী সম্মেলন ও তারপরের সময়ে এই আকাঙ্খা বিজ্ঞানকেও প্রভাবিত করেছে বৈ কি? এই সব প্রভাবকে সঙ্গে নিয়েই আমরা একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেছি।

স্বাভাবিক ভাবেই একবিংশ শতাব্দীর অন্তত প্রথম দিকে আমরা বিগত দিনগুলোর কিছু ধারাবাহিকতা দেখতে পাবো। উনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীতে আমরা যখন আসছিলাম তখনো বিজ্ঞান মানুষের জীবনযাত্রার প্রযুক্তিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করতে শুরু করেছিলো– অন্তত উন্নত বিশ্বে। বিদ্যুৎ চালু হয়েছিল, হয়েছিল টেলিফোন ও মোটরগাড়ী। রেডিয়োর আসি আসি অবস্থা। কিন্তু আজকের মত প্রভাবটি সর্ববৃবিস্তৃত ছিলনা, আর এত সরাসরি বা তাৎক্ষণিকও ছিলনা। কিন্তু আজ বিশ্বায়নের যুগে জীবনযাত্রায় মানুষের আকাঙ্খাগুলো এবং অর্থনৈতিক বাজার বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তিও অগ্রযাত্রায় খুব বড় নিয়ামক হতে বাধ্য। সেদিন বিজ্ঞান যতটা স্বাধীন ও নিজের গন্ডীতে থেকে তার গতিপথ ঠিক করেছিল, আজ সেটি অনেকটাই অসম্ভব। তাই প্রযুক্তি-বাজারের আজকের সীমান্ত-যুদ্ধগুলোকে লক্ষ্য করলে খানিকটা আঁচ করা সম্ভব বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা কোন কোনদিকে প্রসারিত হবার সম্ভাবনা অধিক। তাছাড়া মানুষের জীবনভঙ্গীতে আর চিন্তার ধারায় যে সব

মৌলিক পরিবর্তন এখন ঘটছে সেগুলো বিজ্ঞান চর্চার পুরো ব্যাপারটিকেও যে অনেকটা মৌলিকভাবে পরিবর্তিত করে দেবেনা, তাও বা কে বলতে পারে।

এই মৌলিক পরিবর্তনের প্রসঙ্গে আমার কাছে যেটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে তা হলো বিজ্ঞানে বিশ্বব্যাপী মানুষের অংশগ্রহণ বাড়বে। তথ্য প্রযুক্তিই এই বাড়াকে অনিবার্য করে তুলবে। কম্পিউটারের সঙ্গে মানুষের মিথস্ক্রিয়ার যে ক্রমবর্ধমান সুযোগ তা শুধু কম্পিউটার বিজ্ঞানকেই দ্রুত সমৃদ্ধ করবেনা, কম্পিউটারের মাধ্যমে অন্যান্য বিজ্ঞান চর্চার পরিধি বাড়াবে। বিজ্ঞানের অনেক শাখাতেই আজ চর্চার বেশ খানিকটা জুড়ে আছে কম্পিউটারে প্রোগাম লেখা, কম্পিউটার সিম্যুলেশন করা ইত্যাদি। এ সবে অনেক বেশি মানুষের অংশ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। তা ছাড়া তথ্য প্রযুক্তি যে ভাবে এগোচ্ছে পৃথিবীর নানা প্রান্তের বিজ্ঞানীরা নিত্য কানেক্টেড হয়েই কাজ করবেন- ল্যাবোরেটরির সীমিত গন্ডীতে তাঁদের কাজকে বাঁধা যাবেনা। ভার্চুয়াল ল্যাবোরেটরি, রিমোট ল্যাবোরেটরি অনেক দেশের অনেক গবেষকদলকে একই সঙ্গে কাজ করতে দেবে। বিজ্ঞানকে 'পাবলিক নলেজ' হিসাবে দেখার প্রবণতাটি বিংশ শতাব্দীর। কিন্তু বিজ্ঞান চর্চাকেও সত্যিকার 'পাবলিক একটিভিটি'তে পরিণত করার কৃতিত্ব বোধ হয় থাকবে একবিংশ শতাব্দীর হাতেই।

এই শতাব্দীর শুরু থেকেই বিজ্ঞানী মানুষ বেশি বেশি নিজের দিকে তাকাচ্ছে, অর্থাৎ নিজের জৈব সত্ত্বার দিকে। অতীতে তাঁরা বস্তুজগতের কথা যত মৌলিকভাবে উদ্ঘাটন করেছেন, জীবজগতের কথাকে সেভাবে পারেননি। এখন বোধ হয় সেই বিপ্লবটিই ঘটতে যাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীতে কোয়ান্টাম বিপ্লবের সমতুল্য কিছু জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘটাটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া প্রযুক্তিগত দিক থেকে এই বিষয়ে মানুষের আকাঙ্খা এখন আকাশছোঁয়া হয়েছে এবং দ্রুত এগোবার চাপটিও তাই অত্যন্ত বেশি। মানব জোনোম প্রকল্প এখন সমাপ্ত। অর্থাৎ মানুষের বিস্তারিত জেনেটিক পরিচয় সবার করায়ত্ত হয়েছে—আমরা মোটামুটি জেনেছি আমাদের কোন জিনটি কিসের জন্য দায়ী, কি পরিবর্তন করতে হলে কোনটির কলকাঠি নাড়তে হবে। এই জ্ঞানে বলীয়ান হয়ে মানুষ যে নিজের উপর কি করতে না পারবে সেটিই ভাবার বিষয়।

জেনেটিক কারিগরির ক্ষেত্রে প্রজাতির সীমা ইতোমধ্যেই লঙ্ঘিত হয়েছে। নানা প্রজাতির জীবের মধ্যে জিনের প্রতিস্থাপন থেকে চলছে, এমন কি উদ্ভিদের জিন প্রাণীতে পর্যন্ত। পুরো জীবজগতটাই এখন এই কারিগরের কাঁচামাল। তাই জীব-বৈচিত্র এখন অমূল্য জাতীয় সম্পদ-এর উপর সত্ত্ব নিয়ে এখন সবাই খুব সচেতন হচ্ছে, ভবিষ্যতে আরো হবে। একবিংশ শতাব্দী যত এগোবে ততই হয়তো মানুষ

তেলের খনি বা লোহার খনির চেয়ে দেশের জীব-বৈচিত্র্যকে অধিক বড় সম্পদ বলে মনে করতে শিখবে।

বিজ্ঞানীরা এখন মানব দেহকে ক্রমেই তাঁদের বৈধ এলাকা করে নিচ্ছেন - শুধু জরুরী কারণে ছোট খাট রদবদল নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে মৌলিক পরিবর্তনের জন্য। মানব ক্লোনিং এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। টিস্যু ক্লোনিং এর মাধ্যমে একেবারে খাস করে নিজের জন্য তৈরি দেহের সব রকমের স্পেয়ার পার্টস- তাও বেশি দূরে নয়। এই প্রক্রিয়া কতদূর যাবে, নিজেকে মানুষ কতখানি বদলাবে, কতখানি নবায়ন করবে, আয়ুষ্কালের সম্ভাবনা কতখানি বাড়িয়ে দিতে পারবে, এমন কি নিজের বংশধরকে কতখানি আর-সদৃশ, আর কতখানি নতুন পরিকল্পিত রূপ দেবে- এগুলো একবিংশ শতাব্দীতে পরবর্তী অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা জানতে পারবো। তবে এ সবের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা এখন এমন অচিন এলাকায় চলে যাচ্ছেন, এমন সব প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন যা তাঁরা অতীতে কখনো চিন্তা করেন নি। উদাহরণস্বরূপ একজন মানুষের সঙ্গে তার অরিজিনাল দেহটির কি সম্পর্ক সেটি নির্ধারণ করতে হবে। আমার প্রায় সবকিছুই যদি বদলে যায়, এখনও আমি কতটুকু আমি থাকবো, আসলে আমিটাই বা কি, এ ধরনের বেয়াড়া প্রশ্নের উত্তর হয়তো তাঁকে দিতে হবে।

ভুক্তভোগী মানুষ হিসাবে দরিদ্র দেশের আমরা একবিংশ শতাব্দীর এসব অগ্রগতি থেকে আরো কিছু আশা করতে পারি। হয়তোবা জৈব প্রযুক্তি খাওয়া-পরা-জ্বালানি-স্বাস্থ্য ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা মেটাবার অভাবে যে দারিদ্র তার থেকে আমাদেরকে অব্যাহতি দিতে পারবে। এই দিকটিতে হয়তো আমাদেরও অবদান থাকবে। বিশ্বায়নের একটি ইতিবাচক ফল হিসাবে হয়তো দুনিয়ার মানুষ দুনিয়াটাকে একসঙ্গে টেকসই করার কথা ভাববে। বৈষম্যের মাধ্যমে একাংশকে টেকসই করার দুরাশা বাদ দিয়ে, পরিবেশকে প্রাকৃতিক থাকতে দিয়ে, অসীম প্রবৃদ্ধির দিকে ধাবিত না হয়ে, অন্য ধরনের একটি সমৃদ্ধ জীবনমানকেই দুনিয়ার সবাই তৃপ্তিকর বলে মেনে নেবে। ঐ পরিস্থিতিতে উন্নয়নশীল আমাদের পক্ষেও সে রকম তৃপ্তিকর অবস্থার কাছাকাছি যাওয়া যেমন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হবে তার অর্জনে অবদান রাখাও সহজ হবে। বিজ্ঞান এমনি একটি পরিস্থিতির দিকে যাবার সহায়ক হলে তাকে একবিংশের একটি বড় বিপ্লব হিসাবে স্বাগত জানাতে হবে। ধরিত্রী সম্মেলনের পর থেকে উন্নত বিশ্বসহ সারা দুনিয়াতে এমনি একটি আকাঙ্খা ক্রমে জোরদার হয়েছে।

বিজ্ঞানী যে রকম বেশি বেশি করে দেহগত অর্থে নিজের দিকে তাকাবে তেমনি আর-উপলব্ধি অর্থেও তা করবে। এই প্রক্রিয়াটিও ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। স্পেস প্রোগ্রামের এখন একটি বড় কাজই হচ্ছে পৃথিবীর বাইরে জীবনের সন্ধান করা। এক সময় আমাদের মত বা আমাদের চেয়েও বেশি বুদ্ধিমান প্রাণীর সম্ভাবনাকে ধরে নিয়ে বিজ্ঞানীরা বহু কিছু করেছেন। সিগন্যাল পাঠিয়েছেন চারিদিকে, দূরপাল্লায় যাত্রার আগে এদের সাক্ষাত লাভের সম্ভাবনায় মানুষের আর পরিচয়ের আইডি কার্ড বানিয়ে দিয়েছেন সযত্নে। এখন ক্রমাগত নেতিবাচক ফলাফলে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে জীবনের ছিটে ফোঁটাও, ক্ষুদ্র জীবাণুর আকারে হলেও কোথাও আবিষ্কারের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

অব্যাহত থাকবে এই কারণে যে আসলে মানুষ বুঝতে চায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তার আসল অবস্থানটিকে। বিজ্ঞানের সাধারণ বিচারে এটি স্পষ্ট যে মহাবিশ্বের যে ব্যাপ্তি আর যে বৈচিত্র্য তাতে পৃথিবী নামক একটি ছোট্ট বিন্দুর তেমন কোন আলাদা বৈশিষ্ট থাকার কথা নয়। কাজেই এখানে যা যা ঘটেছে, যার মধ্যে সব চেয়ে বড় জিনিস হলো জীবন, বিশেষ করে মানুষের জীবন, সে রকমটি আরো অসংখ্য জায়গায় হওয়ার কথা। অথচ এ পর্যন্ত বহু চেষ্টায়ও তার কোন প্রমাণ মেলেনি। তা হলে অতি প্রাচীন প্রশ্নটির সম্মুখীন আবার হতে হয়, জীব বিবর্তন কি শুধু এই নগণ্য পৃথিবীটিতেই সম্ভব হয়েছে ? এই গ্রহটি কি এতই বিশিষ্ট যে এখানেই শুধু সম্ভব হয়েছে বিবর্তনের এক সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে এমন বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটেছে যা নিজের সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে সক্ষম। পুরো মহাজগত সম্পর্কে, এমন কি সুদূরতম অতীতে মহাজগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়াটি সম্পর্কেও জানার দাবী করেছে এটি; শুধু তাই নয় নিজেকেসহ আরও অনেক কিছুকে সজ্ঞানে বদলাবার দুঃসাহসও দেখিয়েছে এই বুদ্ধিমত্তা। মানুষের এই আত্মপরিচিতির সন্ধানটি একবিংশ শতাব্দী এগোবার সঙ্গে সঙ্গে আরো প্রবল হবে।

প্রবল হবার একটি বড় কারণ হলো এ সময় হয়তো মানুষ কিছুটা স্থায়ী ভিত্তিতে আমাদের পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বাইরে বসত করার চেষ্টা করবে। আপাতত চাঁদ আর মঙ্গলই লক্ষ্য। পরে অন্যান্য গন্তব্যও যোগ হতে পারে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির অনেকখানিই যেমন এসেছে যুদ্ধবিগ্রহের বা প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে এবং মহাশূন্য অভিযানের প্রয়োজনে, তেমনি একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের অনেকখানিই সৃষ্টি হতে পারে গ্রহান্তরিত হবার প্রয়োজনে। কারণ সত্যিকার ভাবে ঠাঁই বদল করতে হলে এবং তা করে উপকৃত হতে হলে, বেশ কিছু মৌলিক সমস্যার সমাধান আগে বিজ্ঞানকে করতে হবে। এর জন্য বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে বড় ধরণের অগ্রগতির প্রয়োজন হবে।

যেমন ধরা যাক মঙ্গলকে বাসযোগ্য করতে হলে সেখানকার যে বায়ুমন্ডল, ভূমি, ভূগর্ভ সেখান থেকে সম্পদ আহরণ করে প্রয়োজনীয় পরিমন্ডল সৃষ্টি করতে হবে। পানি খাদ্য, জ্বালানী এখান থেকেই আসতে হবে- যা হয়তো সম্ভব হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের প্রক্রিয়াকরণের উপর নির্ভর করে। কৃত্রিম ভাবে পানি, বাতাস তৈরি, কৃত্রিম সালোক সংশ্লেষণ - ইত্যাদির প্রয়োজন হবে। হয়তো দেখা যাবে মঙ্গল নয়, আরো দূরে এমন কি সৌর জগতের বাইরে কোথাও রয়েছে আমাদের জন্য উপযুক্ত ঠাঁই। সেখানে জীবৎকালে গিয়ে পৌছতে হলে অসাধারণ গতি সম্পন্ন মহাশূন্যযান দরকার। কি হবে সেরকম যানের চালিকা শক্তি? সে ক্ষেত্রে মৌলিক আবিষ্কার প্রয়োজন। হয়তো পদার্থবিদ্যার জন্য আরো বড় চ্যালেঞ্জ এখানে লুকিয়ে রয়েছে। আলোর গতির কাছাকাছি গতি যা প্রায় অসাধ্য, যার ক্ষেত্রে আপেক্ষিক তত্ত্বের অনেক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয়, এমনি কিছুর প্রয়োজন হবে। হয়তো বা আলোর গতির সমান গতির অসম্ভবতার মত অমোঘ বিষয়েও নূতন ফাঁকফোকর বের হয়ে যেতে পারে গবেষণার নূতন মাত্রার ফলে। এর কতখানি একবিংশ শতাব্দীতে ঘটবে তা এখন বলা না গেলেও অনেকখানিই যে ঘটবে তা নিঃসন্দেহ।

আমরা সবাই অবশ্য গ্রহান্তরে যাবো না। মানুষের প্রকৃত আবাস আরও বহু কাল এই পৃথিবীতে থাকবে। কিন্তু মানুষের নানা উল্লম্ফনের প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যা ঘটবে তা কিন্তু কম বেশি সকলের জন্যই পাওনা হবে, সকলের জীবনকেই তা বদলাবে। আজ আমাদের অনেকের জন্য যে সব বাধাকে অলঙ্ঘ্য প্রাচীরের মতো মনে হচ্ছে কাল হয়তো তা মনে হবেনা। ঘন বসতির সমস্যা, খাদ্যের সমস্যা, ক্যান্সার বা এইডসের মতো প্রতিকারহীন অসুখের সমস্যা - যেগুলোর সামনে নিজেদেরকে আজ অসহায় বলে মনে হচ্ছে বিজ্ঞানের আগামী অগ্রগতিগুলো সেগুলোকে হয়তো সহজ সমাধানযোগ্য করে ফেলবে। এটি শুধু অযৌক্তিক আশাবাদের কথা নয়, বিজ্ঞানের ইতিহাসই এমনি আশাবাদের জন্ম দিচ্ছে। এই ইতিহাস দেখিয়েছে বিজ্ঞান কোন অন্ধ নিয়তির দ্বারা চালিত হয়নি, বরং মানুষের আশা-আকাঙ্খারই প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এক এক যুগের সমাজ চিন্তা আর অর্থনৈতিক আকাঙ্খা বিজ্ঞানকে সেভাবে সেদিকে ধাবিত করেছে।

যেমন নবায়নযোগ্যতা বিষয়টিকে পঞ্চাশ বছর আগেও বিজ্ঞান তেমনভাবে আমল দেয়নি, কারণ প্রচলিত অর্থনীতি বা সমাজ সেভাবে একে আমল দেয়নি। যখন থেকে দিতে শুরু করেছে বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা সেখানে নিয়োজিত হয়ে সোণা ফলিয়েছে। এখন বিশ্বজোড়া পরিকল্পনা রয়েছে কিভাবে নবায়নযোগ্য শক্তিকে আমরা বেশি বেশি করে কাজে লাগাবো। শক্তি উৎপাদনটিই একমাত্র লক্ষ্য এখন

আর নয়, সেই শক্তির দক্ষতাটাও বড় কথা, যাতে অল্প শক্তি উৎপাদন করেই বেশি কাজ করিয়ে নেয়া যায়। শক্তি উৎপাদনে শুধু সম্পদ ব্যয়ের প্রশ্নটিই বড় নয়, পরিবেশকে টেকসই রাখার প্রশ্নটিও বড়। তেমন ভাবে বিশাল আকারের ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম এক সময় যা করতো, অনেক মালমশলা, অনেক শক্তি ব্যয় করে ক্ষুদ্রাকার সিলিকন চিপ এখন তার চেয়ে অনেক বেশি করছে নগণ্য বস্তু আর নগণ্য শক্তি দিয়ে। এই প্রক্রিয়া আরো অনেক দূর যাবে। সামনে যে ইলেকট্রনিক কৌশলাদি আসবে সেগুলোর কারুকার্য আণবিক অবয়বের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যাবে। ক্ষুদ্রায়নের কাজ আরো বহু মাত্রায় এগিয়ে যাবে। ইলেকট্রনিক কৌশলে এখন বিদ্যুৎ যে ভূমিকা রাখছে, তার কিছু আলোককে ছেড়ে দেয়া হবে। সব কিছু মিলে কাজ বেশি হবে, কিন্তু খাই কম হবে।

আগামী দিনের সমাজ, আগামী দিনের অর্থনীতি যদি বিশ্বের সব মানুষের কথা মনে রেখেই তার অগ্রাধিকার ঠিক করে তা হলে বিজ্ঞানের এই চমৎকার বৈপ্লবিক সম্ভাবনাগুলোও এই পথেই এগোবে, সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সব মানুষকে তার মৌলিক সুফলগুলো পৌঁছে দেবে। এই সুফলগুলোর একটি হবে শিক্ষার কৌশলের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। যার ফলশ্রুতিতে আপাত প্রতিকূল পরিবেশে বাস করেও পৃথিবীর সব শিশু নিজের মেধার ও সম্ভাবনাগুলোর বিকাশ ঘটাতে পারবে আর বিশ্ববিজ্ঞানে অবদান রাখতে পারবে সবার জন্য। মানুষ ক্রমেই বস্তু-সম্পদ, বা ভারী-সম্পদের দিক থেকে মেধা-সম্পদের দিকে যাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর সব চেয়ে বড় অর্জন হয়তো ঘটবে এই প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে। এর জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্বজনীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাগিদ আজ প্রচন্ড ভাবে সৃষ্টি করতে হবে, এবং এ কাজে আমাদের দায়িত্ব হবে খুব বেশি। বিশ্বায়নের ফলে এর জন্য আমাদের আন্দোলন, আমাদেও অবদানটুকু যোগ করার সুযোগ অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি। সেটি সম্ভব হলে আমাদের দেশের ছেলে মেয়ে সেদিন নিজের দেশকে ত্যাগ না করে, আমাদের শ্যামল পল্লীতে বসেই শুধু দেশের ভাত কাপড়ের সমস্যা সমাধানে গবেষণা করবেনা, বরং মহা-একীভূত তত্ত্বের মাধ্যমে জৈব অজৈব সব সত্তার সরল অথচ পরম সুন্দর পরম তৃপ্তিকর ব্যাখ্যা কিভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় সেই গবেষণায় নিমগ্ন হবে। এ কাজে আগাগোড়া সে কানেকটেড থাকবে সারা বিশ্বে ঐ গবেষণার সম্মুখভাগে কর্মরত বাকি সব বিজ্ঞানীদের সঙ্গে। এই লক্ষ্যে কাজে নামার এখনই উপযুক্ত সময়।

কৃত্রিম পোকা

এখনো এটি একটি প্রকল্প মাত্র—তবে খুবই উচ্চাভিলাষী এই প্রকল্প। খুব শিগ্‌গির এর পূর্ণাঙ্গ বাস্ত-বায়িত হবার সম্ভাবনাও কম। কিন্তু এর জন্য যে সব চিন্তা, গবেষণা এবং পদক্ষেপ— তাও কিন্তু কম মূল্যবান নয়। কারণ এটি জড় ও জীবনের মধ্যেকার সীমারেখাগুলোকে বুঝতে খুবই সাহায্য করছে। জীবনের সম্ভাব্য ন্যূনতম রূপ এবং পৃথিবীর বাইরে অন্যত্র অন্য রকম জীবনের ভিন্নতর রূপ কি রকম হতে পারে তার ধারণা পেতেও সাহায্য করছে। জৈব প্রকৃতির অনুকরণে কৃত্রিম পোকা তৈরির এই চেষ্টা এখন আটলান্টিকের এপার ওপার দুদিকেই বেশ কয়েকটি গবেষণা কর্মের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু বিভিন্ন ভাবে এর ধ্যান ধারণাগুলোকে স্পষ্ট করাই নয়, বেশ কিছু প্রাথমিক পদক্ষেপ সফলও হয়েছে তাদের। তবে কৃত্রিম পোকা কবে সত্যি সত্যি আসবে, আদৌ আসবে কিনা, এসব এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে।

যত বেশি বেশি সম্ভব স্বয়ংক্রিয়তা দিয়ে ছোট বড় রোবট তৈরি করে নানা কাজে লাগাতে মানুষ এখন ক্রমেই সিদ্ধহস্ত হচ্ছে। ওদিকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিকাশের মাধ্যমে মানুষের তৈরি ব্যবস্থায় উচ্চ মানের 'বুদ্ধিমত্তা' সৃষ্টিতেও অনেকখানি এগিয়ে গেছেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু কৃত্রিম পোকার বিষয়টি এর থেকে খানিকটা ভিন্ন। এটি সম্ভব হলে একেও বিজ্ঞানীরা এক ধরনের ক্ষুদ্র রোবটের মত কাজে লাগাতে চাইবেন— যেমন হয়তো পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানী তৈরিতে, কিংবা দেহের কোথাও ক্ষত নিরাময়ে। কিন্তু আপাতত: এর বড় চ্যালেঞ্জটি হলো জৈব প্রকৃতিকে অনুসরণ করে তারই একটি কৃত্রিম রূপ তৈরি করা। প্রশ্ন হলো এরকম কৃত্রিম পোকা তৈরির কোন পর্যায়ে গিয়ে বিজ্ঞানী বলতে পারবেন এটি জড় রোবট

নয়, বরং জীবন সদৃশই একটি কৃত্রিম ব্যবস্থা। এ প্রশ্নের একটি সংক্ষিপ্ত জবাব হতে পারে যখন এটি ডারউইনিয়ান বিবর্তনের মতই কোন প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত হবার সক্ষমতা রাখবে। কথাটি সংক্ষিপ্ত হলেও এর সঙ্গে আরো বেশ কয়েকটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তার কথা চলে আসে। সেভাবে বিবর্তিত হতে হলে তার মধ্যে এমন অণু থাকতে হবে যা বংশানুক্রমিক চলার মত তথ্য বহন করতে পারবে– জৈব প্রকৃতির জেনেটিক ব্যবস্থার মত। একই সঙ্গে তার নিজস্ব একটি মেটাবলিজম থাকতে হবে পুষ্টি সংগ্রহ করে বিবর্তন প্রক্রিয়া বজায় রাখার জন্য। তথ্য বাহক আর পুষ্টি প্রক্রিয়া– এই দুইকে একত্রে রাখার জন্য কোন এক প্রকারের 'বাক্স' দরকার হবে– যা জীবের দেহের সমতুল্য। বিবর্তনের প্রাকৃতিক নির্বাচন পদ্ধতি যতক্ষণ না কাজ করতে পারছে অন্তত ততক্ষণ বাক্সটিকে টিকে থাকতে হবে, পরবর্তী বংশ সম্ভব করার জন্য। বাক্স, বংশগতির তথ্য বহন, পুষ্টি ব্যবস্থা– সংক্ষেপে এই তাহলে কৃত্রিম পোকার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত। ন্যূনতমভাবে কি উপায়ে এই সব ক'টির যোগান দেয়া যায় এটিই বিজ্ঞানীদের সমস্যা। তাঁরা বুঝতে পারছেন যে জৈব প্রকৃতিকে তাঁরা অনুকরণ করছেন বটে, কিন্তু এই শর্তগুলো প্রাকৃতিক জীবের মত করেই করতে পারবেন, বা আদৌ সেভাবে করার দরকার রয়েছে তা কিন্তু মোটেই নয়। অন্যভাবে, সহজতর ভাবেও তাঁরা তা চেষ্টা করতে পারেন।

চেষ্টাগুলো কোন পথে এগুতে পারে তা দেখার জন্য আমরা কোন কোন গবেষণা দলের কাজগুলো একটু দেখতে পারি। এই উদ্দেশ্যে গঠিত ইতালীর ভেনিস-ভিত্তিক একটি কোম্পানী 'প্রোটোলাইফ' যৌথভাবে কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্রের লস আলামোস ন্যাশনাল ল্যাবোরেটরীর বিজ্ঞানী রাসমুসেনের সঙ্গে। ঐ ল্যাবোরেটরী এর জন্য অর্থসহায়তা যোগাচ্ছে বলে তাঁরা এ প্রকল্পের নাম দিয়েছেন 'লস আলামোস পোকা'। তাঁরা দেখলেন জীব-জগতে ডিএনএ বহুবিধ এনজাইমের সহায়তা নিয়ে যে জটিল প্রক্রিয়ায় তার জেনেটিক তথ্যকে বাস্তবায়িত করে সে রকম কিছু চেষ্টা করা প্রায় অসাধ্য কাজ হবে। তাঁরা বরং ডি,এন এর অনুকরণে একটি সহজতর অণুর কথা চিন্তা করছেন– পেপটাইড নিউক্লিক এসিড, সংক্ষেপে পিএনএ। এর দুটি রূপ থাকবে– একটি শুধু তেলে দ্রবণীয়, অন্যটি পানির দ্বারাও আকৃষ্ট হয়। ডিএনএর মতই এর পরস্পর সম্পূরক দুটি সুতা-একত্র আবদ্ধ হয়ে থাকে এবং সে অবস্থায় তা পানি থেকে দূরে থাকতে চায়। লস আলামোস পোকার 'দেহ'টি তৈরি হবে শুধু ছোট্ট একটি ফ্যাটি এসিডের (তেল) বিন্দুতে যা পানির মধ্যে ভাসবে। ফলে দুই সুতার আবদ্ধ পিএনএ ঐ তেলের বিন্দুটিতে ডুবে থাকবে– পানি থেকে দূরে থাকার জন্য। ওখানে তেলে দ্রবীভূত হয়ে এর দুই সূতা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তার প্রত্যেকটির পানি-আকর্ষী অংশ উন্মুক্ত হয়ে পড়বে। তখন এটি তেল-বিন্দুর পৃষ্ঠে উঠে এসে পানির কাছে আসবে। সেখানে

পুষ্টি উপাদান হিসাবে পানিতে থাকা তার সম্পূরক নূতন পিএনএ সুতা পেয়ে সে আবার দুই সুতার নূতন পিএনএ গঠন করবে– একই তথ্যের কোড এখনো বজায় রেখে। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে এবং বংশগতির তথ্য ক্রমেই বেশি বেশি পিএনএর মাধ্যমে বিস্তৃত হতে থাকবে। জীব জগতে জীবদেহ পানি-ভিত্তিক হলেও তেলের ফোটারূপী এই পোকার দেহটি হবে মূলত তেল-ভিত্তিক। এখানেও প্রকৃতির সঙ্গে এর একটি বড় পার্থক্য।

বাক্স (দেহ) আর বংশগতিক তথ্য বহনের পর তৃতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এ পোকার জন্য সমাধান করতে হবে তা হলো মেটাবলিজম অর্থাৎ পুষ্টি ব্যবস্থা। এখানেও একবারে ন্যূনতম একটি ব্যবস্থা নেবার পরিকল্পনা রয়েছে। একে 'খাওয়ানো' হবে এমন সব সাধারণ রাসায়নিক দ্রব্য যেগুলো রাসায়নিক ক্রিয়ায় আলোর সাহায্যে ফ্যাটি এসিডে পরিণত হতে পারে। যেহেতু পোকার দেহটিও ঐ ফ্যাটি এসিডেরই একটি ফোটা, কাজেই এই নূতন সৃষ্ট ফ্যাটি এসিড ঐ দেহে যুক্ত হয়ে পুষ্টিতে পরিণত হবে। ফোটার একটি সুনির্দিষ্ট আবরণ থাকবে বলে যখন ফ্যাটি এসিড অণুর সংখ্যা এ আবরণের মধ্যে অতিরিক্ত হয়ে যাবে তখন একটি ফোটা বিভাজিত হয়ে দুটিতে পরিণত হবে। এটিই বংশ বৃদ্ধি। আসলে এর মধ্যে আরো একটু জটিলতা থাকতে হবে। ফ্যাটি এসিড তৈরির যে 'খাদ্য' একে দেয়া হবে তার মধ্যে থাকবে আলোকসংবেদী অণু-যা সাধারণত বৈদ্যুতিক চার্জ বিশিষ্ট একটি অংশকে ঢেকে রাখবে। ফলে এগুলো সম্পূর্ণরূপে তেলে দ্রবণীয় হয়ে পোকার দেহের ভেতরে (তেলের ফোটায়) জমতে থাকবে। যখনই ঐ আলোক সংবেদী আবরণে আলো পড়বে তখনই আবরণ খুলে গিয়ে ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট অংশ উন্মুক্ত হয়ে গড়বে। এ অবস্থায় এটি ফোটার তলদেশে ভেসে উঠবে। এভাবে এত বেশি ফ্যাটি এসিড তলদেশে যোগ হবে যে ওখানে এদের জায়গা হবেনা– দুটি পৃথক ফোটায় বিভক্ত হয়ে তলদেশ বাড়িয়ে নেয়া ছাড়া আর উপায় থাকবেনা। পোকার বংশ বৃদ্ধির এটিই হবে প্রক্রিয়া।

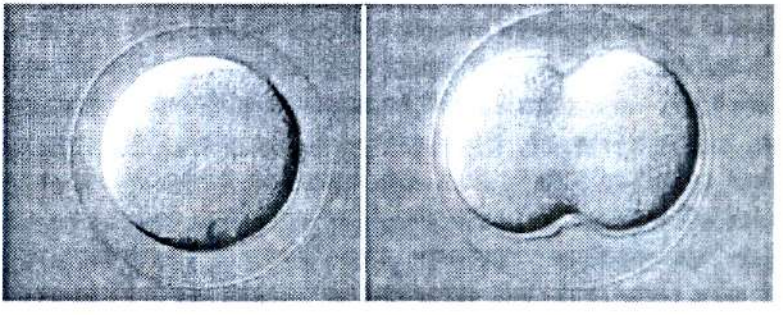

দেহ, বংশগতির তথ্য বহন, মেটাবলিজম সব যখন পরস্পর সমন্বিত ভাবে কাজ করবে, তখনই বির্বতনের সম্ভাবনা দেখা দেবে। তেলের ফোটারূপী পোকার দেহ যখন বাড়বে, বিভক্ত হয়ে বংশ বাড়াবে, তখন একটি টেস্ট টিউবের নির্দিষ্ট পরিসরে ঐ পোকাগুলোরই সংখ্যাধিক্য ঘটবে যেগুলোতে পিএনএর কোড দ্রুত বিভাজন ও বংশবৃদ্ধির জন্য বেশি সহায়ক হবে– অর্থাৎ এক ধরনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' দেখা দেবে ডারউইনিয়ান বিবর্তনের মত।

খুবই প্রাথমিক কিছু রাসায়নিক সাফল্য বাদ দিলে এ সবের প্রায় সবটুকু এখনো ভবিষ্যতের কথা। তবে লস আলামোস পোকার ধারণাটি বেশ সরল ও যৌক্তিক। এর বড় চ্যালেঞ্জটি হলো বংশ-বৃদ্ধি ও মেটাবলিজম– এই দুইকে পরস্পরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সুসমঞ্জস করতে পারা। কারণ সত্যি সত্যি যখন প্রক্রিয়াগুলো শুরু হবে তখন এই দুইয়ের পারস্পরিক বিক্রিয়ার ফলে নূতন কোন বিপত্তির যে উদ্ভব হবেনা এমন নিশ্চয়তা নেই।

কৃত্রিম পোকার বাস্তবায়নে এ ধরনের সম্ভাব্য বিপত্তির প্রতিবিধান যাতে করা যায় সে জন্য ভিন্ন একটি কৌশলের উন্নয়ন করছে জার্মানীতে PACE (প্রোগ্রামেবল আর্টফিশিয়াল সেল ইভেল্যুশন) নামের একটি প্রকল্প। এই প্রোগ্রামেবল কথাটির মধ্যেই পেইসের বৈশিষ্ট্য। কৃত্রিম পোকার ঠিক কোথায়, কখন, কতখানি পুষ্টিদ্রব্য প্রয়োজন হবে তা কম্পিউটারের সাহায্যে নির্ণয় করে নিয়ন্ত্রিতভাবে তা যোগান দেয়াটিই এর উদ্দেশ্য। কম্পিউটারের সংলগ্ন সেন্সরগুলো পি এন এ এর বংশবৃদ্ধি এবং ফ্যাটি এসিডের উৎপাদনটি অনুসরণ করাবে এবং সেই মত ব্যবস্থা নেবে। এর মধ্যে যদি কোন নূতন উপসর্গ উপস্থিত হয় সেটিও প্রোগ্রাম অনুযায়ী কম্পিউটার সামাল দেবে। এ যেন জীবন্ত কিছুকে বাঁচিয়ে রাখার মত, কিন্তু তা করা হচ্ছে একটি 'লাইফ সাপোর্ট' সিষ্টেমের সাহায্যে। যখন এই সাপোর্ট সিস্টেমের এক একটি দিক প্রত্যাহার করা যাবে তখন ধীরে ধীরে কৃত্রিম পোকা সত্যি সত্যি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পোকা হয়ে উঠতে পারবে।

আমরা যদি কাঙ্খিত কৃত্রিম পোকাটিকে রীতিমত 'জীবন্ত' একটি কিছু হিসাবে দেখতে চাই তা হলে প্রশ্নটি থেকে যাবে যে ঠিক কোন পর্যায়ে গিয়ে এটি জীবন্ত হয়ে উঠলো। অনেকে মনে করছেন– সে রকম একটি সুনির্দিষ্ট পর্যায় খোঁজার চেষ্টা না করাই ভাল। বরং বলা যায় 'বিবর্তন' সদৃশ প্রক্রিয়ায় বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার একটি ক্ষমতা এই পোকার মধ্যে বংশানুক্রমে বৃদ্ধি পাবে– এবং এটি যতই হবে ততই এটি বেশি 'জীবন্ত' হয়ে উঠবে। শিগগির কোন সময় এর থেকে পূর্ণ জীবন্ত আচরণ আশা করাটি উচিত হবে না। প্রকৃতিতে জীবন বিবর্তিত হয়েছে কোটি কোটি বছরের প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে। ফলে সেখানে

নিউক্লিক এসিড ও বিভিন্ন এনজাইমের সমন্বয়ে যে অত্যন্ত কার্যকর সিষ্টেম গড়ে উঠছে সাধারণ কিছু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তার অনুকৃতি কয়েক বছরেই সম্ভব হবে এটি দুরূহ কল্পনা। আর যাই থেকে সেটি যে আপাততঃ তেমন দক্ষ কিছু হবে না, তা বলাই বাহুল্য। তারপরও লস আলামোস পোকার পেছনে গবেষণাকারী বিজ্ঞানীদের উৎসাহের ও আত্মবিশ্বাসের কমতি নাই।

আর এই প্রচেষ্টায় লস আলামোস পোকাই একমাত্র প্রতিযোগী নয়। আরো বেশ কিছু বিজ্ঞানী-গ্রুপ একই ধরনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন, যদিও তাঁদের বিভিন্নটির পথ বিভিন্ন। যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে বায়োলজিক্যাল এনার্জি অলটারনেটিভ নামের প্রতিষ্ঠানের কিছু বিজ্ঞানী একসময় মানব জেনোম প্রকল্পে কাজ করে মানুষের জেনেটিক গঠনের উদ্ঘাটনে অবদান রেখেছেন। এখন তাঁরা সত্যিকার ব্যাকটেরিয়ার কোষ থেকে তার জেনেটিক বস্তু বের করে ফেলে এবং তাকে কিছু সরলতর কৃত্রিম জেনেটিক বস্তু দিয়ে পূরণ করে - প্রায় কৃত্রিম নূতন জীবন সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। এই কৃত্রিম জেনোমের মধ্যে লস আলামোস পোকার মতো ন্যূনতমভাবে কাজ চলে এমন ব্যবস্থাই থাকবে। যেহেতু তাঁরা ব্যাকটোরিয়ার দেহের বাকি অংশ হুবহু ব্যবহার করছেন, কাজেই তাঁদের ফলাফলটি একেবারে কৃত্রিম হবেনা, এবং সে কারণে তাঁদের কাজও অন্যদের চেয়ে দ্রুততর এগিয়ে যাচ্ছে। রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা হাতে নিয়েছেন 'ন্যূনতম কোষ প্রকল্প' নামের প্রচেষ্টা। একটি সরল ঝিল্লির আবরণের মধ্যে একেবারেই অপরিহার্য কিছু কোষ উপাদান প্রকৃতি থেকে নিয়ে তাঁরা একটি 'ন্যূনতম কোষ' তৈরির চেষ্টা করছেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বিজ্ঞানীরা প্রায় লস আলামোস পোকার মতই একটি সাধারণ কেমিস্ট্রি-ভিত্তিক বিবর্তন-যোগ্য পূর্ণ কৃত্রিম ব্যবস্থার উপর কাজ করছেন। তাঁদের 'কোষে' RNA-সদৃশ কিছু অণু ছাড়া আর বিশেষ কিছুই থাকবেনা– তবে সেটিই নিজের প্রতিলিপি তৈরির অনুঘটক হিসাবে কাজ করতে পারবে।

কার্যত এই বিজ্ঞানীরা যেটি করছেন তা হলো জীব আর জড়ের মধ্যে থাকা শেষ প্রতিবন্ধকতাগুলোকে সরাবার চেষ্টা। তাঁদের বর্তমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাফল্যগুলোকে তাঁরা যদি এরকম একটি সামগ্রিক স্কীমে রূপ দিতে পারেন তবে তা হবে মানুষের জন্য একটি বিশাল সাফল্য। এই জীবের অনুকৃতির এই মৌলিক সাফল্য ছাড়াও এর থেকে বাস্তব প্রয়োগেরও নানা সুযোগ সৃষ্টি হতে পারবে।

কৃত্রিম পোকার চমৎকার ব্যবহার হতে পারে একে যদি সুনির্দিষ্ট একটি কাজের উপযোগী করে তোলা যায়– যেমন বিষময় রাসায়নিক দ্রব্যকে ভেঙ্গে ফেলে বিষমুক্ত করার কাজ, কিংবা হাইড্রোজেন জ্বালানীর মত উপকারী ক্যামিক্যাল তৈরির কাজ। বর্তমানে অবশ্য কিছু কিছু প্রাকৃতিক ব্যাকটোরিয়াকে এ ধরনের

কাজে লাগানো হচ্ছে। তবে কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ফলে এসব ব্যকটোরিয়ার কার্যক্ষমতা নানা মাত্রায় বিস্তৃত হয়েছে। এখন এদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট কাজে কেন্দ্রীভুত রাখা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কৃত্রিম পোকার সুবিধা হবে এগুলো একটি বিশেষ কাজের উপযোগী হিসেবেই গড়ে উঠবে, এর বাইরে যাবেনা, অথচ নিজের বিবর্তনের ক্ষমতা থাকবে বলে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে নিজ থেকে খাপ খেয়ে নিয়েই তারা এ কাজ করতে পারবে।

একই প্রক্রিয়ায় এরা আমাদের শরীরে গিয়ে যথাস্থানের জন্য যথা ওষুধও হয়তো তৈরি করতে পারবে, এবং সে ওষুধ সময় সময় প্রয়োজন মত সেখানে প্রয়োগেরও ব্যবস্থা করতে পারবে। এরা যেন হবে একরকম জীবন্ত ওষুধের ফ্যাক্টরি ও জীবন্ত ইনজেকশন। অন্যদিকে এরা হয়তো বিশেষ কোন লক্ষণের খোঁজে আমাদের শরীরে ঘুরে বেড়াতেও পারবে, অনুসন্ধানীর মত তথ্য সংগ্রহের কাজে। শেষ অবধি বড় লক্ষ্যটি হবে এই কৃত্রিম পোকাগুলো যাতে তার নিজের মধ্যে কোন সমস্যা বা বিকৃতি ঘটলে তা যেন নিজেই মেরামত করতে সক্ষম হয়– জীবদেহে যে রকম ব্যবস্থা রয়েছে। এমনটি সম্ভব হলে এরা হয়তো এমন জৈবিক কম্পিউটারও গড়ে তুলতে পারবে যেখানে হিসাবের যে কোন ত্রুটি তা নিজেই সংশোধন করে নিতে পারবে।

এ ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ কিছু সৃষ্টির মধ্যে সব সময় কিছু ঝুঁকি থাকবে বৈকি। যেমন এরা কখনো আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার ঝুঁকি। এ ধরণের ঝুঁকি অবশ্য বিজ্ঞানীরা বরাবরই নিয়েছেন– হাইব্রিড শস্য, জেনেটিকালী পরিবর্তিত মাছ, ক্লোন করা ভেড়া– কোন কিছুই এ রকম ঝুঁকির বাইরে ছিলনা, এখনো নেই। কৃত্রিম পোকার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানীরা যে এরকম সতর্ক ঝুঁকি নিতে ভয় পাবেননা তা বলাই বাহুল্য। আর এক ধরনের আপত্তি আসা স্বাভাবিক যে রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে কৃত্রিম ভাবে জীবন-সদৃশ কিছু সৃষ্টির নৈতিক সমর্থন এই বিজ্ঞানীরা পাবেন কিনা। সে ক্ষেত্রে অনেকে বলছেন এখনো এই বিতর্কে যাওয়ার সময়ই হয়নি। কারণ এই পথটি এখনো বেশ দীর্ঘ, এবং এর বহু পর্যায় থেকে যে কোন দিকে মোড় নেবার বা থেমে যাবার সুযোগ আমাদের রয়েছে। মানুষের জ্ঞান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটাবার চেষ্টাটি একান্তই মানুষের চিরন্তন প্রেরণা, এবং একেবারেই মানবিক। সেদিক থেকে কৃত্রিম পোকার লক্ষ্যে কাজ করা মানবিক ঔৎসুক্যেরই একটি অংশ। এই প্রক্রিয়ায় আর একটি জিনিস সামনে চলে আসছে। যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানীরা যে প্রশ্নটির নিজস্ব উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করছেন তা হলো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে জীবন কি? জড় ও জীবের সীমারেখায় কাজ করার মাধ্যমে তাঁরা এর উত্তরের আরো কাছাকাছি যেতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

কম্পিউটার, ফাইল থেকে চেয়ারটি প্রিন্ট করে দিন্ তো, দেখি বসতে কেমন লাগে

এখন আমাদের কম্পিউটারের সঙ্গে যে প্রিন্টারটি রয়েছে তার বদলে যদি একটি ত্রিমাত্রিক প্রিন্টার ব্যবহার করি, তা হলে বেশ মজার আদেশ কম্পিউটার তামিল করতে পারবে। প্রয়োজনীয় যে কোন বস্তু, যার ডিজাইন কম্পিউটারে নক্সা হিসাবে ফাইল করা আছে, প্রিন্ট কমান্ড দিয়ে কম্পিউটারকে বলা যাবে তাকে সত্যি সত্যি বস্তুতে পরিণত করতে। আমাদের দ্বিমাত্রিক পুরানো প্রিন্টারটি চেয়ারের নক্সাটি শুধু কাগজের ছবি হিসাবে দিতে পারে। কিন্তু ত্রিমাত্রিক প্রিন্টারটি মুদ্রণ করে দেবে গোটা চেয়ারটিকেই– যার উপর আমরা সত্যি-সত্যি বসে দেখতে পারবো। পছন্দ না হলে কম্পিউটারের নক্সাটি দরকার মত বদলে সেই বদলানো চেয়ারটিরই প্রিন্ট চাইতে পারব আবার।

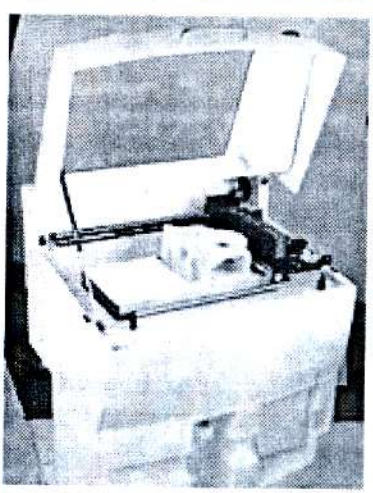

অবশ্য এখনো ত্রিমাত্রিক প্রিন্টারের যেই দাম তাতে চেয়ার প্রিন্ট নেয়াটা তার উদ্দেশ্য হবেনা। আসলে ত্রিমাত্রিক প্রিন্টারের শুরুটিই হয়েছিল মূল্যবান ছোট যন্ত্রাংশ যা মাত্র দু'একটি লাগবে, তা দ্রুত তৈরি করে নেবার জন্য। যে সব যন্ত্রাংশের উপর

পরীক্ষা নিরিক্ষা চলছে, কম্পিউটারে নানা রকম ভাবে তাকে ডিজাইন করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তার প্রত্যেকটিতো আর সত্যিকার উৎপাদন ব্যবস্থায় তৈরি করা সম্ভব নয়, তাই আপাতত এর একটি নমুনা তৈরির জন্য উদ্ভাবিত হয়েছিল ত্রিমাত্রিক প্রিন্টার। জিনিসটি গুরুত্ব পেতে শুরু করলো আকস্মিক ঘটনায়।

১৯৯০ এর দশকের মাঝামাঝি বিমান উৎপাদনকারী বোয়িং কোম্পানী মহাশূন্যে স্পেস স্টেশন স্থাপনের প্রকল্পে কিছু কাজ পেয়েছিলো। এ কাজে বোয়িংকে তৈরি করতে হচ্ছিল ৫০টি ছোট ছোট প্লাস্টিকের বাক্স– যার প্রত্যেকটি একটি আর একটির থেকে আলাদা আকৃতির। সাধারণত তৈরি করতে হলে এদের প্রত্যেকটির জন্য ইনজেক্শন মোল্ডিং করতে আলাদা ছাঁচ বানাতে হবে– পুরা কাজে লেগে যাবে অন্তত নয় মাস। অথচ এক্ষুণি এগুলো দরকার। তাই তারা ভাবলো আপাতত ত্রিমাত্রিক কম্পিউটার প্রিন্টার থেকে চলনসই বাক্স সহজে বানিয়ে নিয়ে সেগুলোর উপরেই তারা পরীক্ষা নিরিক্ষা করবে তাদের ডিজাইনটা পরস্পর ফিট করছে কিনা, মহাশূন্যের বায়ুশূন্য অবস্থায় তা টিকবে কিনা ইত্যাদি দেখতে। ঐ ত্রিমাত্রিক প্রিন্টারে প্রিন্ট কমান্ড দিলে কম্পিউটারে থাকা নক্সা অনুযায়ী লেজার বীমের সাহায্যে নাইলনের কণা স্তরে স্তরে জমা হয়ে নাইলনের বাক্সটিই গড়ে উঠে– মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে। মজার ব্যাপার হলো এই 'সস্তা' বাক্সগুলো কিন্তু চমৎকার কাজ করলো, ডিজাইনটি সুন্দর ফিট শুধু করলনা বিভিন্ন প্রেশার টেস্টেও পাশ করলো। তখন বোয়িং ভাবল, তাই যদি হয় তা হলে এগুলোকেই স্পেস স্টেশনে

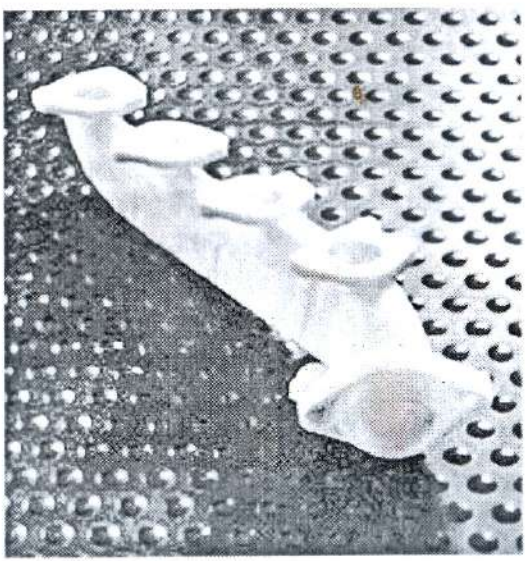

পাঠিয়ে দেয়া নয় কেন? সেই থেকে মহাশূন্যে ঐ স্পেস স্টেশনে এই ৫০টি তাৎক্ষণিক তৈরি বাক্স দিব্যি কাজ করে যাচ্ছে।

আর এরকম সাফল্যের ফলে ত্রিমাত্রিক প্রিন্টারকেও নূতনভাবে সমীহের চোখে দেখা আরম্ভ হলো। শুধু পরীক্ষা নিরিক্ষার অনিশ্চিত সময়টাতে তাৎক্ষণিক যে কোন বস্তু বা যন্ত্রাংশ তৈরি করাটাই এর কাজ রইলোনা, আসল ব্যবহার্য জিনিস তৈরির কাজেও একে লাগানো হলো। এর সামরিক ব্যবহারটিও চোখ এড়ায়নি। দূরবর্তী রণাঙ্গনে ট্যাংক বাহিনী যখন যুদ্ধ করছে তখন ট্যাংকের কোন অংশ কিভাবে নষ্ট হবে, আংশিক ধ্বংস হবে কেউ আগে থেকে জানেনা। যদি সে সময় একটি কম্পিউটার আর তার সঙ্গের ত্রিমাত্রিক প্রিন্টার থাকে, তাহলে ছোটখাট অংশ এখানেই, ঐ প্রিন্টারেই তৈরি করে ট্যাংক মেরামত করে নেয়া যায়। অনেকে বলছেন ত্রিমাত্রিক প্রিন্টারের ব্যবহার শুধু স্পেস স্টেশন তৈরি বা যুদ্ধ বিগ্রহের মত জবরদস্ত কাজে সীমাবদ্ধ থাকবে কেন? আমাদের ঘরের টুকিটাকি পেতেও একে ব্যবহার করা যাবে। তাঁদের মতে বাড়িতে বাড়িতে সাধারণ প্রিন্টারের মত ত্রিমাত্রিক প্রিন্টারও থাকবে। আমরা নিজেই ডিজাইন করে, বা অন্যের ডিজাইন পছন্দমত বদলে নিয়ে আটপৌরে টুকিটাকিগুলো নিজেই 'প্রিন্ট' করে নেব। অবশ্য যদি প্রিন্টার সে রকম সস্তা হতে পারে।

সস্তা অনেকটা হয়েছে বটে, তবে অতটা হয়নি। শুরুতে যা আড়াই লক্ষ ডলার দাম ছিল এখন তা ত্রিশ হাজারে নেমে এসেছে। বাড়িতে আসতে হলে আরো অনেক কমতে হবে। ত্রিমাত্রিক প্রিন্টারের প্রযুক্তিও বদলাচ্ছে। এর বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে একটি হলো সাধারণ ইঙ্ক-জেট প্রিন্টারের নীতির উপর। ইঙ্ক-জেটে যেমন ফোয়ারার মত গিয়ে কালি কাগজে জমে ফোটায় ফোটায়, এখানে তেমনি নাইলন বা অন্য কোন প্লাস্টিক জমা হয়ে হয়ে বস্তু গড়ে তোলে। আর একটিতে এমন পলিমার ব্যবহার করা হয় যা আলট্রা-ভায়োলেট আলো যেখানে যেখানে পড়ে সেখানে শক্ত হয়ে গিয়ে বস্তু গড়ে। অন্য আর একটিতে প্লাস্টিক জমে স্তরে স্তরে যা আগেই বলা হয়েছে। সহজলভ্য হবার পর বিশেষ করে ডিজাইনের পরীক্ষা-নিরিক্ষার জন্য এরকম প্রিন্টার যে উদ্ভাবকদের জন্য একটি চমৎকার যুৎসই ব্যবস্থা এনে দেবে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

যতক্ষণ পর্যন্ত নেহাৎ নমুনা তৈরির জন্য বা ডিজাইনের ভাল-মন্দ বুঝার জন্য সাময়িক ব্যবহারে আমরা একে কাজে লাগাচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত এর প্রযুক্তি বা জিনিসটি তৈরির কাঁচামালটি নিয়ে আমাদের চিন্তা কম। প্লাস্টিক ধরণের কিছু হলেই হলো। কিন্তু যদি আমরা বস্তুটিকে সত্যি সত্যি স্থায়ীভাবে ব্যবহারের চিন্তা করি তাহলে সবকিছু অন্যভাবে ভাবতে হয়। চেয়ারের যে ডিজাইনটি কম্পিউটারে

করলাম তাতে বসতে কেমন লাগে সেটি বুঝতে একটি নমুনা চেয়ার বানানো এক কথা, যেটি দু'এক ঘন্টা টিকলেই যথেষ্ট; কিন্তু যদি বাড়ির সার্বজনীন ব্যবহারে ও অত্যাচারে বছরের পর বছরের জন্য একটি চেয়ার তৈরি করতে হয়, সেটি ভিন্ন কথা। পরতে পরতে কাঁচামালের বিন্যাস ঘটিয়ে বস্তু গড়লে বস্তুটির দৃঢ়তা, স্থায়ীত্ব কতটা আসবে তা না জেনে সে রকম স্থায়ী হবার কথা ভাবা যায়না। অতি সম্প্রতি এগুলো সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ভাল ধারণা এসেছে। এখন তাই শুধু নমুনা তৈরির জন্যই নয় নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের জন্যও ত্রিমাত্রিক প্রিন্টারের কথা আসছে।

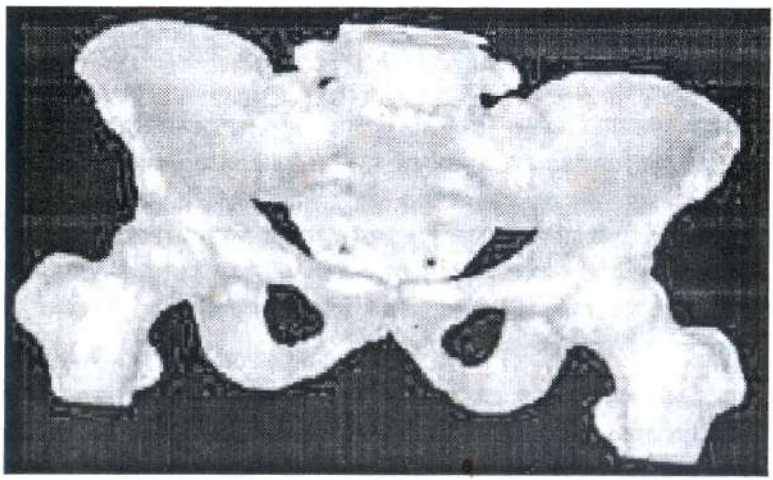

তবে যা বহু সংখ্যায় দীর্ঘ দিন ধরে উৎপাদন করতে হবে এমন জিনিসের জন্য কম্পিউটার প্রিন্টার ব্যবহার করাটি পোষাবেনা, যেমন পোষায়না কোন বইয়ের পাঁচ-দশ হাজার কপি ছাপাতে কম্পিউটার প্রিন্টারের ব্যবহার। কিন্তু নিজের অফিসে ব্যবহার করতে যদি মাত্র দশটি কপি দরকার হয় তাহলে ছাপাখানায় না পাঠিয়ে কম্পিউটা প্রিন্টারেটাই অনেক সস্তা। ত্রিমাত্রিক প্রিন্টার ব্যবহারেও এই দিকটিই গুরুত্ব পাবে। অনেক কাজে এরকম একটিই বা কয়েকটি জিনিসেরই দরকার হয়। যেমন বোয়িং কোম্পানীই এখন এফ-১৮ ফাইটার বিমানের ১০০টি বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরির কাজে এ প্রিন্টার ব্যবহার করছে। বেশ জটিল ডিজাইনের যন্ত্রাংশ তৈরি করতে এর জুড়ি নাই। বোয়িং স্পেস শাটলের ইঞ্জিনের মধ্যেও কয়েকটি অংশ এভাবে বানিয়েছে। এ সব কাজের জন্য বোয়িং একটি আলাদা কোম্পানীও দাঁড় করিয়েছে যার নাম দিয়েছে 'অন ডিমাণ্ড ম্যানুফেকচারিং' অর্থাৎ 'চাহিবা মাত্র উৎপাদন'– খুবই সার্থক নামা কোম্পানিই বটে।

অনেক সময় ব্যক্তিগতভাবে এক একজনের জন্যই মাপমত ফিট করে এমন জিনিস তৈরিতে ত্রিমাত্রিক প্রিন্টারের জুড়ি নাই। যেমন আগে কানে শুনার অসুবিধার জন্য হিয়ারিং এইড প্রত্যেকের কানে হবহু ভাবে ফিট করাতে তা হাতে ঘষা মাজা করে ফিট করাতে হতো– তাতে ঠিক ভাবে ফিট করানো কঠিন ছিল। এখন কাজটি খুব সোজা হয়ে গেছে। কানের ভেতরের একটি মোমের ছাঁচ নিয়ে ত্রিমাত্রিক স্ক্যানারের সাহায্যে তার ডিজিটাল তথ্য কম্পিউটারে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর এটি থেকেই প্রিন্টার প্রিন্ট করে দেয় হুবহু এই আকৃতির একটি হিয়ারিং এইড যার ভেতরে সব ইলেকট্রনিক অংশ দিয়ে দেয়া হয়। এইডটি অনায়াসে ঐ ব্যক্তির কানে খাপের খাপ ফিট করে যায়– আর তা বাইরে থেকে দেখা যাওয়ারও কোন সম্ভাবনা থাকেনা। আরো কিছুদিন পর ত্রিমাত্রিক প্রিন্টার এরকম অসংখ্য কাজে লাগবে বলে ফটোকপি মেশিনের মত বাজারে বাজারে এই সার্ভিস পাওয়া যাবে। ভেঙ্গে গেছে এমন কোন জটিল জিনিস নিয়ে গেলে সেখানে তার কম্পিউটার কপি নিয়ে হবহু আর একটি বানিয়ে দেয়া যাবে তাৎক্ষণিক ভাবে।

আজকাল যে সব ত্রিমাত্রিক প্রিন্টার পাওয়া যাচ্ছে তাতে মোম থেকে শুরু করে প্লাষ্টিক, সিরামিক ইত্যাদি দিয়ে বস্তু তৈরি করা যাচ্ছে। কিন্তু সবার লক্ষ্য হলো ধাতু দিয়ে বস্তুগুলো তৈরি করতে পারা– কারণ স্থায়ীত্বের জন্য ধাতুর জুড়ি নাই। তা ছাড়া ধাতু, সেমিকন্ডাক্টর ইত্যাদির সমন্বয় ঘটাতে পারলে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিও কম্পিটারের সার্কিট ডিজাইন থেকে সরাসরি 'ছাপিয়ে' নেয়া যাবে। এখন সেই ধাতুর ব্যবহারও সবে সম্ভব হয়েছে।

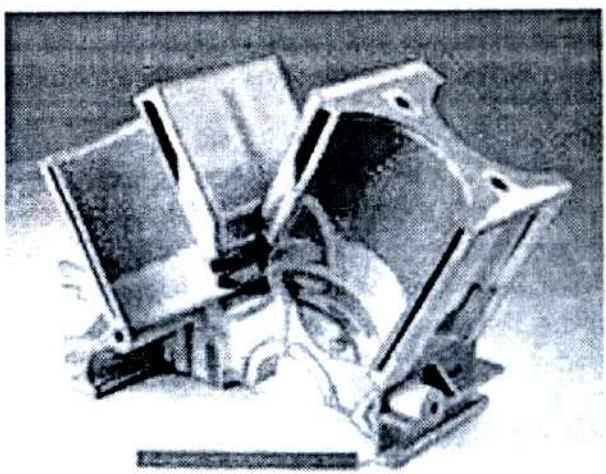

পদ্ধতিটি এক্ষেত্রেও মোটামুটি একই। ধাতুর ক্ষুদ্র কণিকা ব্যবহার করে এতে লেজার রশ্মির সাহায্যে সেগুলোকে একীভূত করে নেয়া হয়। এজন্য ধাতব কণাগুলোর উপর পলিমার মেখে নেয়া হয় তা গলে ধাতু কণাকে একীভূত করার সুবিধার জন্য। এভাবে স্তরে স্তরে ধাতব বস্তুটি গড়ে তোলার পর এমন উত্তাপ প্রয়োগ করা হয় যাতে পলিমার উবে যায় আর ধাতুকণাগুলো আংশিক গলন্ত অবস্থায় এসে পরস্পর স্থায়ী জোড় নিয়ে নেয়। এরপরও ধাতব কণাগুলোর মধ্যে যে ক্ষুদ্র ফাঁকগুলো থেকে যায় সেগুলোকে অন্য একটি গলিত ধাতু যেমন ব্রোঞ্জ ঢুকিয়ে ভরাট করে নেয়া হয়। এখন সমস্যা হলো এ ভাবে তৈরি ধাতব বস্তুর গুণাগুণ গুলোর সঠিক ভাবে পূর্বাভাস দিতে পারা। এটি করার পর রকেট বা বা অন্যান্য বিরল ইঞ্জিনের মূল্যবান যন্ত্রাংশ তৈরিতে নিয়মিতভাবে এ প্রিন্টারকে ব্যবহার করা যাবে। সেক্ষেত্রে ব্যাপক সংখ্যায় উৎপাদনের গরজ নাই বলে ভারী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন আর হবেনা- কাজগুলো অনেক সস্তায় করা যাবে।

ত্রিমাত্রিক প্রিন্টারকে সস্তা ও সহজলভ্য করার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিমাত্রিক স্ক্যানারকেও তেমনটি করার প্রয়োজনীয়তা এসে পড়ে। এই স্ক্যানারের কাজ হলো কাগজের ডকুমেন্টকে স্ক্যান করে কম্পিউটার তথ্যে পরিণত করার মতো একটি গোটা বস্তুকেও তা করা। নমনীয় মডেল বা মূর্তি আগে বানিয়ে নিয়ে, বা সত্যিকার কোন জিনিসের মত হুবহু কম্পিউটার ডিজাইন করে, পরে প্রিন্টারের মাধ্যমে স্থায়ী বস্তু তৈরি করতে চাইলে প্রথমে মূল জিনিসটি স্ক্যান করে নিতে হবে। বর্তমানে যে সব স্ক্যানার এ কাজের জন্য রয়েছে সেগুলো খুবই ব্যয়সাপেক্ষ আর ভারী জবড়জং। সাধারণত নানা দিক থেকে এক যোগে সারিবদ্ধ বহু ক্যামেরায় ফটো তুলে স্ক্যানিং এর কাজ করা হয়। এই ফটোগুলোকে কম্পিউটার আবার তিন মাত্রায় সাজিয়ে মুল জিনিসটির প্রতিকৃতি গড়ে।

সম্প্রতি স্ক্যানিং-এর কাজে সম্পূর্ণ নূতন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে যা একেও সাধারণ মানুষের কাছে এনে দিতে পারে। এতে একটি ঘূর্ণায়মান টেবিলের উপর বস্তুটি রাখা থাকে। একটি প্রজেক্টার থেকে আলোর বীম একটি ঝাঁঝরির ভেতর দিয়ে এমন ভাবে বস্তুর উপর এসে পড়ে যাতে বস্তুটির উপর অনেকগুলো আড়াআড়ি আলোকিত রেখা সৃষ্টি হয়। আলোর ফোকাস থাকে বস্তুর ঠিক সামনে, তাই বস্তুর বিভিন্ন বিন্দু আগে পিছে কতখানি আছে সেই অনুসারে তার উপরের আলো ফোকাসের ততখানি বাইরে যায়। এখন একটি মাত্র ক্যামেরা ঘূর্ণায়মান বস্তুটির ছবি তুলতে থাকে পরপর– যাতে এর প্রতিটি বিন্দুতে আলো-ছায়ার কিনারাটা কত তীক্ষ্ণ (আলোর ফোকাসের উপর নির্ভরশীল) তা রেকর্ড হয়ে যায়। এর থেকে ঠিক হয় ঐ বিন্দু সামনে-পিছনে কোন জায়গায় আছে। এভাবে পুরো

বস্তুটির সব অংশের আকৃতির সব তথ্য ক্যামেরা থেকে কম্পিউটারে চলে যায়। পরে এর রঙের তথ্যগুলোও যোগ হয়। এভাবে কম্পিউটারে পুরো বস্তুর প্রতিকৃতি গড়ে তোলা হয়। একটি অসুবিধা হলো বস্তুর ভেতরের দিকে কোন গর্ত, ছিদ্র ইত্যাদি থেকে সব তথ্য ক্যামেরায় ঠিক মত ধরা নাও পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে পরে বস্তুটিকে তার পাশের উপর টেবিলে দাঁড় করিয়ে, টেবিল ঘুরিয়ে আবার ছবি নিতে হবে এবং সে সব তথ্যও যোগ করতে হবে। আশাবাদীরা মনে করছেন যে এই পদ্ধতিটি এতই সহজ ও ছিমছাম যে দু'বছরের মধ্যেই এর ভিত্তিতে ত্রিমাত্রিক স্ক্যানার মাত্র দু'শ ডলারেই পাওয়া যাবে। এখন আমরা যে রকম যেকোন ছবি, ফটো ইত্যাদি যখন খুশি স্ক্যান করে স্থায়ী সংরক্ষণের জন্য কম্পিউটার বা সিডিতে রেখে দিচ্ছি, তেমনি আমাদের প্রিয় আসবাবপত্র বা ব্যবহার্য জিনিসকে একইভাবে স্ক্যান করে রেখে দিতে পারবো। পরে প্রয়োজনে ওরকম আর একটি প্রিন্ট করে নিলেই তা আবার ব্যবহারে চলে আসবে।

বাড়ি চটপটে হচ্ছে, এরপর জ্ঞানী হবে

বাড়ি যে চটপটে হচ্ছে তা আমাদের দেশেও অনেকে দেখতে পাচ্ছে। বাড়িতে যে টেলিভিশন স্ক্রীন লাগছে তাতে সিনেমা হলের আমেজ পাওয়া যাচ্ছে আকারে, আওয়াজে। অনেক কিছুই এখন অটোমেটিক। ব্রড ব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ লেগে গেছে। তার মানে কম্পিউটার এখন চব্বিশ ঘন্টাই দুনিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত। বাড়িতে বসেই দুনিয়ার নানা প্রান্তের সঙ্গে চ্যাটিং করছি, অর্থাৎ লিখিত আলাপ। তবে চাওয়া মাত্র মুখের আলাপও করতে পারছি– টেলিফোনেতো পারছিই কম্পিউটারে ভয়েস-ওভার-ইন্টারনেটেও পারছি। আরো দারুণ হলো ছোট্ট একটি ওয়েব ক্যামেরার (কম্পিউটারের সংলগ্ন ক্যামেরা যা ইন্টারনেট সংযুক্ত) বদৌলতে অনেকের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিংও করতে পারছি। দুনিয়ার অপর প্রান্তে আলাপের সঙ্গীকে দেখতে পাচ্ছি, তার আশপাশের সব কিছু দেখছি সেও আমাকে দেখছে বাড়িতে বসে মুড়ি ভাজা খেয়ে তার সঙ্গে গল্প করতে। অগ্রসর দেশগুলোর দেখাদেখি আমাদের বাড়িটিও চটপটে হয়ে উঠছে বৈ কি!

মুখে হুকুম দিয়ে

তবে অন্যত্র এর চেয়েও অনেক বেশি চটপটে বাড়ি হয়েছে। যে সব কাজে হাত একটু লাগাতেই হতো সেগুলোও এখন শুধু হুকুম দিলেই হলো। হুকুম দেবার দুটি কায়দা কী বোর্ডে বোতাম টিপে, অথবা আরো জমিদারী কায়দায় সোজা মুখে আওয়াজ করে। এই শেষেরটাই লোকে পছন্দ করছে বেশি। ভয়েস সেনসিটিভ সব যন্ত্রপাতি কোনটি বৈধ লোকের গলা তাও বঝুতে পরছে। মোবাইল ফোনটি দিয়েই এখন সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা যায় বাড়িতে না থেকেও করা যায় গাড়িতে, অফিসে

বসে, কিংবা অন্য শহরে বা অন্যদেশে থেকে। দূর থেকেই পারছি কোন ঘরে বাতি জ্বলবে, নিভবে ঠিক করতে, রান্না ঘরে চুলা জ্বালানো রেখে আসলাম কিনা সেই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেতে, এবং প্রয়োজনে তা বন্ধও করতে। তবে শুধু এসব দরকারি আটপৌরে কাজ করার জন্য বাড়িটি চটপটে হয়নি। তার আসল কেরামতি জ্ঞানচর্চা আর বিনোদনের ক্ষেত্রে।

সবই বেতারে

আগে বাড়িতে কম্পিউটারের সঙ্গে নানা রকম তারের ক্যাবল ঝোলাঝুলি করতো– কোনটা যেত কী বোর্ডে, কোনটা মাউজে, কোনটা স্পীকারে, প্রিন্টারে, ইন্টারনেটে ইত্যাদি। এখন তার আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সবই ওয়্যারলেস ব্যবস্থা, পরস্পরের সঙ্গে বেতারে সংযুক্ত। তাছাড়া তথ্য মোবাইল থেকে কম্পিউটারে যাচ্ছে, কম্পিউটার থেকে মোবাইলে আসছে। সেটাকে যেখানেই নিচ্ছি পরস্পরের যোগসূত্র কিন্তু কাটছেনা। বাড়িতে এখন বেশ কয়েকটা কম্পিউটার, প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কে যুক্ত। মোবাইল ফোনেই রয়েছে ডিজিট্যাল ক্যামেরা। ক্ষণে ফটো তুলছি, ক্ষণে তা কম্পিউটারে পাঠিয়ে বড় করে দেখছি, ক্ষণে তা ইমেইলে পাঠিয়ে দিচ্ছি দুনিয়ার অন্যত্র। না শুধু তাই করছিনা। কম্পিউটারের মনিটর স্ক্রীন ছোট, সেখানে ছবি দেখে সুখ নাই। বিশাল টেলিভিশন পর্দায় দেখে আরাম। টেলিভিশনের সঙ্গেও রয়েছে সব ব্যবস্থা তাই ফটো দেখা, ডিভিডি থেকে সিনেমা দেখা সবই চলে ওখানেই। বাড়ির প্রতি কামরাই ওয়্যারলেস ব্রড ব্যান্ডের কল্যাণে ইন্টারনেটে সংযুক্ত। কাজেই কিছুই করতে অসুবিধা হচ্ছেনা। MP3 ব্যবস্থায় কম্পিউটারে হাজার হাজার গানের ভান্ডার থেকে এখন ইচ্ছে মত গান বাছাই করে শুনতে পারছি। তবে এক্ষেত্রেও মন ভরছেনা। শিগগির ড্রইং রুমে সোফায় বসে জমজমাট আওয়াজের স্টিরিও থেকেই ঐ গান শুনবো। টেলিফোনেরও এই সুবিধা এখন অনেক জায়গায়। বসা থেকে না উঠে, হাত অন্য কাজের জন্য ফ্রি রেখে, প্রয়োজনে ঘরের সবাইকে অংশ গ্রহণ করতে দিতে স্পীকার ফোনেই এখন কথা বলা যাচ্ছে যেমনটি ঘরে উপস্থিত মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলি, অনেকটা সেভাবে।

বিনোদনের চূড়ান্ত হলো বাড়িতে পুরোদস্তুর একটি সিনেমা। সিনেমা হলে যেমনটি সারাউন্ড সাউন্ড সিষ্টেম থাকে তার পুরো আমেজ নিয়ে আসা হয়েছে বাড়ির সিমানায়। বড় স্ক্রীন, হাই ডেফিনশন উন্নত টেলিভিশনেও সিনেমা দেখার যে আমেজ আসেনা, দৃশ্য, শব্দ, সার্বিক আবহ মিলিয়ে, এই বাড়ির সিনেমায় এখন তাই নিয়ে আসা হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই আবহ সৃষ্টি করা যায়। সিনেমা হলের পরিবেশে সামনে-পেছনে-পাশে সব দিক থেকে যোগ্যমত

আওয়াজের মধ্যে ডুবে থেকে, জমজমাট ভাব নিয়ে সিনেমা দেখার মজাই যে আলাদা!

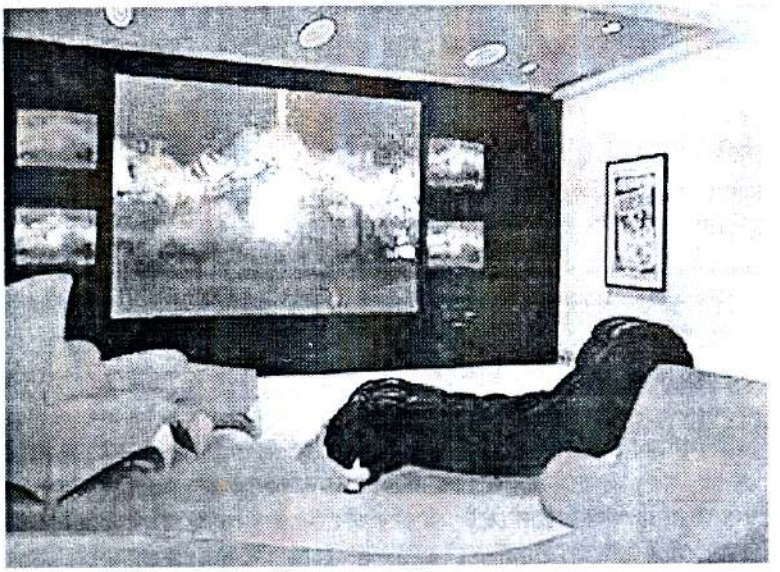

আসার আগেই প্রস্তুত

বিনোদন অবশ্য একটি দিক মাত্র। বাড়ির অনেকগুলো নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয় রয়েছে ঘর ঠান্ডা গরম করা, কামরায় কামরায় আলোর ব্যবস্থা করা, খাবার দাবারের ব্যবস্থা– তার জন্য ফ্রিজ, ওভেন, স্টোভ ইত্যাদি, এসব নিত্য প্রয়োজনের জিনিস নিয়ে। যখন বাড়িতে কেউ নেই তখন অনর্থক ঘর ঠান্ডা করে রাখার কি প্রয়োজন। কিন্তু বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণ আগেই ঠান্ডা করার প্রসেস শুরু করে দেয়া দরকার যাতে বাড়িতে ঠিক সঠিক তাপমাত্রায় ঢোকা যায়। রান্নার মেন্যুই শুধু নয়, পুরো রান্নার প্রোগ্রামটি এখন কম্পিউটারে করা যায় এবং সেই প্রোগ্রামের নির্দেশ মত রান্না করার ওভেন এখন রয়েছে। এই নির্দেশ বাড়িতে থেকে দিতে হবে এমন কোন কথা নেই, ইন্টারনেটে যে কোন জায়গা থেকে দেয়া যায়। কাজেই বাড়ি ফেরার আগে রান্নাও হয়ে গিয়ে একেবারে তৈরি খাবার পাওয়া যাচ্ছে।

পরামর্শদাতা ফ্রিজ

আরো চমকপ্রদ হচ্ছে চটপটে বাড়ির চটপটে ফ্রিজটি। এই ফ্রিজ খাবার দাবারকে শুধু ঠান্ডা রাখেনা, এটি খাবার দাবারের হিসাবও রাখে। এর সঙ্গে যে কম্পিউটার

চিপ থাকে সেটি কোন খাবার কখন রাখা হলো, কোনটির ভাল থাকার সময়সীমা কতদিনের ইত্যাদির হিসাব রাখে। এর উপর ভিত্তি করে ফ্রিজ আমাদেরকে সাবধান করে দেবে কখন কোন খাবার খেয়ে ফেলতে হবে, কখন ফেলে দিতে হবে ইত্যাদি। শুধু তাই নয় চটপটে ফ্রিজটি এখন কিছুটা জ্ঞানীও হয়ে উঠছে। এর প্রোগ্রাম করা কম্পিউটার ফ্রিজে রাখা মাল মশলা দিয়ে কি কি খাবার রান্না করে ফেলা যায় তার পরামর্শ দিয়ে রেসিপিও বাৎলে দেবে। ফ্রিজের গায়ে চমৎকার স্ক্রীনে সেটি দেখিয়ে দিতে পারে। অবশ্য ঐ স্ক্রীনে অধিকাংশ সময় সিনেমা দেখাটাই নিয়ম, এর আশপাশে যারা থাকবে তাদের জন্য। কোরিয়ান একটি কোম্পানী এরকম ইন্টারনেট সংযুক্ত ফ্রিজ ইতোমধ্যেই বাজারজাত করেছে। ঐ একই কোম্পানী ঐ রকম চটপটে নেট-সংযুক্ত ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, এয়ারকন্ডিশনার এবং বড় পর্যায়ে প্রজেক্ট করা টেলিভিশনও বাজারজাত করেছে।

অবস্থা বুঝে কাজ

বিভিন্ন কামরায় আলো জ্বালানো নেভানো বা বিভিন্ন মৃদু বা উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা করার কাজটি আমরা দু'ভাবে করতে পারি। এটি প্রোগ্রাম করা কম্পিউটারের হাতে ছেড়ে দিতে পারি, যথাসময়ে যথাব্যবস্থা নেবার জন্য। অথবা আমাদের মোবাইল দিয়ে যে কোন স্থানে থেকে নিজেই হুকুম দিয়ে দিতে পারি। তবে এক্ষেত্রেও বাড়ি ক্রমেই জ্ঞানী হয়ে উঠছে। মানুষের আনাগোনা, তাদের অবস্থান, কাজ ইত্যাদি বুঝে নিয়ে প্রয়োজন মত আলো জ্বালাতে নিভাতে অভ্যস্ত হচ্ছে এটি।

সবরকম গার্হস্থ্য যন্ত্রপাতি দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালানো এখন সহজ হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্ব পাচ্ছে। যেমন বাড়িতে ছোট বাচ্চাদের যদি রেখে যেতে হয়, তা হলে কোন কোন বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি একেবারে লক করে রাখা সম্ভব দূর থেকেই মোবাইল ফোনে। বাচ্চা টোস্টার বা হিটারে হাত দিয়ে কিছুই করতে পারবেনা, লক করা বলে ওটা চালুই হবে না। তাছাড়া ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশন তো বাড়ির সব কোণায় কোণায় থাকবে, যার মাধ্যমে কম্পিউটারে বা মোবাইলের স্ক্রীনে ইচ্ছে হলে যে কোন জায়গা থেকে দেখে নেয়া যাবে বাড়িতে কি কি ঘটছে। সে সব দেখে শুনে দূর থেকে কাজের হুকুম দেয়া যায় অনায়াসে।

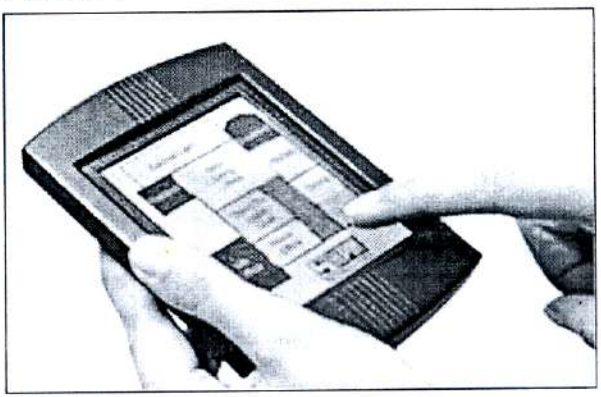

নিভৃত কর্মীরা

আমরা খেয়াল না করলেও বাড়িতে নীরবে আমাদের অনেক সেবক কাজ করে যাবে, এখনো যাচ্ছে। না আমি ফ্রিজের খাবার ঠান্ডা রাখা, বা এয়ারকণ্ডিশনারে ঘর ঠান্ডা রাখার কাজের কথা বলছিনা। সে রকমতো অনেক কিছুই করছে। এই ওয়াশিং মেশিনের কথাই ধরা যাক না কেন। প্রোগ্রাম করা ওয়াশিং মেশিন ঠিক কতক্ষণ সাবান পানিতে, কতক্ষণ পরিষ্কার পানিতে, কত গরম পানিতে, কতখানি নেড়ে চেড়ে কাপড় ধোবে, শুকাবে সব কিছু নিজের থেকে করে ধোয়া ও শুকানো কাপড় রেডি রাখছে। এখন আবার একে ইন্টারনেটে সংযুক্ত করে দূর থেকে নির্দেশ দেবার মত করে তৈরি করা হয়েছে। তবে সব কিছুকে টেক্কা দিয়েছে বাড়ির ছোট্ট নীরব ঝাড়ুদারটি। অধিকাংশ সময় একে দেখা যাবেনা কারণ সে হয়তো সোফা কিংবা বিছানার তলার ধুলা কুড়াতে ব্যস্ত, কিন্তু দরকার হলে দিন রাত কাজ করে পুরো বাড়িকে ঝকঝকে তকতকে করে রাখতে অত্যন্ত পটু এটি। বাজারে খুব ভাল ভাবে এসে গেছে বলে এর কথা একটু বিস্তারিত বলা যাক।

রুমবা, জুমবট, ট্রিলোবাইট

ওদের এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে, আর নানা বাড়িতে কাজেও পাওয়া যাচ্ছে। এরা হলো বিভিন্ন কোম্পানীর তৈরি রোবট ঝাড়ুদার। রোবট বা ঝাড়ুদার কারো মতই দেখতে নয় এরা। বরং তাদের আকৃতি ছোট খাট চাকতির মতই কতকটা ব্যক্তিগত ওজন নেবার মেশিনের আদলে। সহজেই যে কোন কিছুর তলায়, ঘরের ফাঁক ফোকরে ঢুকে কাজ করতে পারে। মূলত এরা ছোট খাট ভ্যাকুয়াম ক্লীনার ধূলাবালি ময়লা শোষণ করে নেয়। কিন্তু এরা নিজেরাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে, ব্যাটারী থেকে শক্তি নিয়ে ঘরের সর্বত্র নিজে নিজে নীরবে ঘুরে ঘুরে কাজ করে। এটি করতে গিয়ে সব রকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এরা নিজেরাই নিতে পারে। যেমন কোন কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খাবার আগে সরে যেতে পারে, কোন কিছুর ক্ষতি করার বা নিজের ক্ষতি করার আগেই। ঝাড়ু দিতে দিতে সিঁড়ির কাছে গেলে এদের ইনফ্রা-রেড আলোর সেন্সর ঠিক সিঁড়ির ধাপ বুঝতে পারে এবং এর চলা বন্ধ করে দেয় যাতে সিঁড়িতে পড়ে না যায়। রুমবা, জুমবট, ট্রিলোবাইটের কোনটাই অবশ্য এখন পর্যন্ত সিঁড়ি বেয়ে কাজ করতে পারেনা। শুধু চলাফেরার সতর্কতা নয়, কোন কারণে বড় কিছু মুখে আটকে গিয়ে এদের ভ্যাকুয়াম ব্লক হয়ে গেলে কোন অঘটন ঘটার আগেই এর মোটর বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া বিনা কারণে যেন ব্যাটারী খরচ না হয় সেজন্য একে মেঝ থেকে উপরে উঠালেও মোটর বন্ধ হয়ে যায়। ইনফ্রা-রেড আর আলট্রা-সাউন্ডের সেন্সর ব্যবহার করে এরা দেয়াল ঘেঁষে বিভিন্ন কিনারা, কোণা ইত্যাদির কাছ দিয়ে চলতে চলতে সেখানে পরিস্কার করতে পারে। এদের সব কটি অবশ্য সামনে ক্যাবল, তার বড় কাগজের টুকরা, ধাতু খন্ড এসব পড়লে বেশ বিব্রত হয়, এসব মেঝেতে না থাকলেই ভাল।

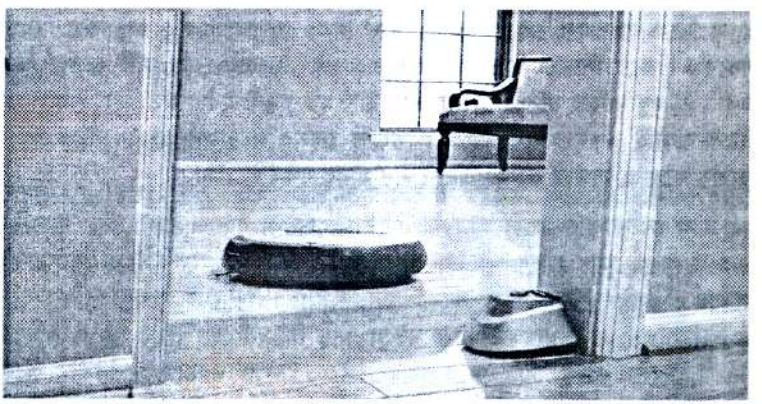

একই ধরনের কাজ করলেও বর্তমান বাজারে এদের দামের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। জুমবটের দাম খুবই কম– মাত্র ৯০ ডলার। সাধারণ শক্ত সিমেন্ট, টালি বা কাঠের মেঝেতে জুমবট অন্য দামীগুলোর মতই কাজ করতে পারে। কিন্তু কার্পেট, গালিচা, ম্যাট এসব ভাল করে পরিস্কার করতে পারে না। রুমবা এখন বেশ জনপ্রিয় হলেও, দাম জুমবটের চেয়ে তিনগুণ বেশি। এও কার্পেট এবং বিশেষ করে মেঝের সঙ্গে আটকানো নেই এমন ম্যাট ইত্যাদি পরিস্কারে তেমন সুবিধা করতে পারে না। এসব অবশ্য চমৎকার করতে পারে ট্রিলোবাইট– যদিও দামটি তুলনামূলক ভাবে বেজায় বেশি, ১৫০০ ডলার।

একটি জিনিস কিন্তু এসব রোবট-ঝাড়ুদাররা চমৎকার করে। রিচার্জেবল ব্যাটারীতে চলে বলে বেশিক্ষণ কাজ করতে গিয়ে তাদের কিছু পর পর ব্যাটারী রিচার্জ করতে হয়। এটি এরা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই করে। ব্যটারীর চার্জ কমে এলে এরা নিজে নিজে ঘরের বিশেষ জায়গার প্লাগ করা চার্জারের কাছে গিয়ে এর সঙ্গে সংলগ্ন হয়। যতক্ষণ না যথেষ্ট চার্জ হয় ততক্ষণ এখানে সংলগ্ন থেকে চার্জ নিতে থাকে। তারপর আবার নিজে নিজেই এর থেকে সরে গিয়ে কাজ করতে চলে যায়। অবশ্য শুধু ট্রিলোবাইটই নিজের থেকে আবার কাজ শুরু করতে পারে। অন্যগুলোকে কেউ আবার ষ্টার্ট করে দিতে হয়।

ভবিষ্যতে আমাদের বাড়িতে অন্যান্য রোবট সেবকরা কিভাবে কাজ করবে তা আজকের জুমবট, রুমবা আর ট্রিলোবাইটকে দেখে কিছুটা আঁচ করা যাচ্ছে।

জ্ঞানী হবার পথে

জুমবট- রুমবার মত রোবট কর্মীদের দিয়ে ঘরের কাজ করানো, কিংবা দূর থেকে হুকুম দিয়ে বা আগে প্রোগ্রাম করে রেখে কাজ করানো এক কথা, কিন্তু অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে বাড়ি নিজেই যখন ব্যবস্থা নেয় সেটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। এ শুধু বাড়ির চটপটে হওয়া নয়, রীতিমত জ্ঞানী হবার মত একটি ব্যাপার! এমন ঘটনাই এখন ঘটতে যাচ্ছে। সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন প্রায়ই ঘটতে পারে বিশেষ করে এ সিদ্ধান্ত নেবার জন্য কোন মানুষ যখন থাকেনা।

ধরা যাক কোন বাড়িতে বা কামরায় একজন বৃদ্ধা বা বৃদ্ধ একা থাকেন। কতদিন ধরে এ ঘরে কোন সাড়া শব্দ নাই। বাতি যে জ্বালানো হয়েছিল তা জ্বালানোই রয়েছে। এসব অবস্থা লক্ষ্য করার জন্য বাইরের মানুষের অবকাশ আজকাল কোথায়? কিন্তু এখন এরকম ঘটনা ঘটলে বাড়ি নিজেই টের পাবে পুলিশ অফিসে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফোন চলে যাবে বিপদসংকেত দিয়ে বাড়িটি পরিদর্শন করার

অনুরোধ জানিয়ে। বাড়ির সাধারণ নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রেও একই রকম হবে। চোর ডাকাতের দুশ্চিন্তা নিজেকে করতে হবে না।

আরো নানা রকম সিদ্ধান্তের প্রয়োজন রয়েছে। বড় বাড়ি, কখনো একটি ঘর ব্যবহার হচ্ছে, কখনো হচ্ছেনা, কখনো পার্টি করে সবাই হল ঘরেই অনেক্ষণ কাটাচ্ছে। সে সব ক্ষেত্রে বাড়ি নিজেই ব্যবহারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে নিজ থেকেই বাড়ির নানা অংশে গরম-ঠাণ্ডা বুঝে জানালা খুলে দেবে, এয়ারকন্ডিশনিং বন্ধ করে দেবে– জ্বালানী বা বিদ্যুৎ খরচ সাশ্রয় করে যাবে এভাবে।

বাড়িকে জ্ঞানী করে তোলার কাজে জাপানীরা আয়োজন করছে নানা রকম 'বুদ্ধিমান' রোবটের। সেখানে উদ্ভাবিত পাপেরো রোবট এ ধরনের কাজতো করেই, এমন কি মানুষের মুখের ভাব পরীক্ষা করে বুঝতে পারে সে এখন কি পছন্দ করবে– কোন পানীয়, কিংবা একটু ঠান্ডা হাওয়া, নাকি এমন অন্য কিছু।

ন্যানো-টেকনোলজির আশ্বাস

অষ্ট্রেলিয়ায় এক ধরনের জ্ঞানী বাড়ি গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে- এর জন্য একটি মডেলও তৈরি হয়েছে যার নাম দেয়া হয়েছে 'ন্যানো হাউস।' এর পেছনে আছে ক্রম বিকাশমান ন্যানো-টেকনোলজির ব্যবহার। এই প্রযুক্তি হচ্ছে খুবই ক্ষুদ্র। প্রায় আণবিক আকারের যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদি তৈরির মাধ্যমে। এমন যন্ত্র বাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসংখ্য ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব। ধরা যাক প্রত্যেক ইটের সঙ্গেই তৈরির সময় লেগে থাকবে এরকম ন্যানো যন্ত্র, যাদের কাজ হবে শুধু ঐ অংশটুকুর রক্ষণাবেক্ষণ করা, পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি। এভাবে নিত্য, স্বয়ংক্রিয় রক্ষণাবেক্ষণ থেকে একটি ইটও বাদ যাবেনা। শুধু তা কেন, বাড়ির রঙের সঙ্গেই হয়তো মেশানো থাকবে এরকম ন্যানো-মনিটর যারা বাড়ির প্রত্যেক বিন্দুতে উত্তাপ থেকে শুরু করে গ্যাস লীক পর্যন্ত যে কোন জিনিসের উপর নজরদারি করতে পারবে, সেভাবে ব্যবস্থাও নিতে পারবে।

ব্যক্তিগত দেখাশুনায়

বাড়ি শুধু নিজের যত্ন নিলে, জ্বালানি সংরক্ষণ করলেই তার জ্ঞান আমাদেরকে ততটুকু মুগ্ধ করবেনা, যতনা করবে এটি যদি আমাদেরকে, অর্থাৎ তার বাসিন্দাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে যত্ন নেয়, বিশেষ করে আমাদের সু-স্বাস্থ্যের জন্য। এর একটি ভাল উপায় হবে আমাদের অন্তর্বাসের সঙ্গে বেতার ব্যবস্থার মাধ্যমে সংযুক্ত রাখা বাড়ির কম্পিউটার ব্যবস্থাকে। অবশ্য এ অন্তর্বাস যেন-তেন সেই গেঞ্জি বা আন্ডারওয়্যার হবে না, এতে অতি সূক্ষ্ম নানা রকম ডাক্তারি সেন্সর

থাকবে যা আমাদের শরীরের হার্টবিট, রক্তচাপ, উত্তাপ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপ সব সময় কম্পিউটারে পাঠাতে থাকবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলো দীর্ঘমেয়াদী ডাক্তারী পরীক্ষার প্রয়োজনেই কাজে লাগবে, তাৎক্ষণিকভাবে কাউকে জানাবার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু যখনই কোন ব্যতিক্রম ঘটবে তখন কম্পিউটার বিষয়টি বিশ্লেষণ করে পরামর্শ দেবে, প্রয়োজনে ডাক্তারকে জানাবে, এমনকি খুব গুরুতর পরিস্থিতিতে মুহূর্তের মধ্যে ব্যবস্থা নেবে– সিগন্যাল দিয়ে, আওয়াজ করে আমাদেরকে জানিয়ে দেবে এক্ষুণি কি করণীয়।

বাড়িতে ব্যক্তিগত দেখাশুনার জন্য ভাল আর একটি জায়গা রয়েছে– সেটি বাথরুম। আগামিতে বাথরুমের নানা অংশ আমাদের স্বাস্থ্য দেখাশুনার নানা দায়িত্ব পালন করবে এবং সবই কম্পিউটার ব্যবস্থাকে জানাতে থাকবে। নিজে নিজে নীরবে ওজন নেয়া থেকে শুরু করে, মল-মূত্রের পরীক্ষা, প্রত্যেকটি দাঁতের অবস্থা, শরীরের চামড়ায় কোথাও সংক্রমণের কোন সম্ভাবনা চিহ্ন– সবই জানা হয়ে যেতে পারে এখানকার কম্পিউটারের– দাঁত মাজতে গিয়ে, টয়লেট ব্যবহার করতে গিয়ে ও গোসল করতে গিয়ে। আমরা নিজেরা অবশ্য এর কোন কিছু বুঝতে পারবনা, এ নিয়ে কোন ভাবনারও প্রয়োজন হবেনা বেশির ভাগ সময়। ভাবনার প্রয়োজন যদি হয় তবে সেটি ভাববে বাড়ির কম্পিউটার, যেখানে বাড়ির সবার জন্য হেলথ ফাইল খোলা রয়েছে, বাথরুমে ঢুকতেই বায়োমেট্রিক সনাক্তকরণের মাধ্যমে কম্পিউটার জানবে কার ফাইল খুলতে হবে।

চটপটে বাড়ির ভাবসাব দেখে অনেকে বলতে শুরু করেছিলেন এ আমাদেরকে কুড়ের বাদশা করে তোলার একটি আয়োজন মাত্র যাতে আমরা বাড়ির সুইচটাও নিজে না টিপি। এখন চটপটে বাড়ির সব কাজকে একত্র করে যখন নেয়া হচ্ছে তখন কিন্তু এভাবে বলে তাকে উড়িয়ে দেয়ার কোন উপায় নেই। এ এখন জ্ঞানী হতে চলছে, আমাদেরকে নানা দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি দিতে চলছে।

যেই সুর লক্ষ্যভেদী

অনেক মানুষের ভিড়ে আপনি রয়েছেন হয়তো কোনো হলঘরে, অথবা জনতার মধ্যে। দূরে থালার মতো দেখতে একটি আধ মিটারের মতো ব্যাসের একটি জিনিস দু'হাতে ধরে কেউ আপনার দিকে তাক করল, অনেকটা আয়না ঘুরিয়ে কারো গায়ে দূর থেকে আলো ফোকাস করার মতো। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ কনসার্টের উচ্চ আওয়াজের মিউজিকের মধ্যে আপনি ডুবে গেলেন। অথচ আপনার পাশে যিনি রয়েছেন তিনি কিছুই শুনতে পারছেন না। সেই থালাটা এবার সামান্য একটু ঘুরিয়ে দেয়া হল যাতে এর থেকে আসা সেই সুউচ্চ আওয়াজের শব্দরেখা আপনার কাছ থেকে সরে পাশের জনের মাথার উপর গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে এ মিউজিক আপনি হারিয়ে ফেললেন, বড়জোর ফিসফিস একটু শুনতে পাচ্ছেন যেমন করে কাছের কোনো মানুষের কানে লাগানো হেডফোন থেকে শোনা যায়। এখন মিউজিকে ডুবলেন আপনার পাশের জন।

যেভাবে বলা হল তাতে এই অভিনব ব্যাপারটিকে একটি মজার খেলনা মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে এটি কিন্তু শব্দ-প্রযুক্তির জগতে একটি বড়রকমের পরিবর্তনের আশ্বাস দিচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে গবেষণা চলছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যামব্রিজ ম্যাসচুসেটসের এমআইটিতে মিডিয়া ল্যাবে। বাণিজ্যিকভাবে এ যন্ত্রে উন্নয়নের জন্য অপেক্ষা করছে বিশাল বাজার সম্ভাবনা। কারণ এটি হবে প্রচলিত লাউডস্পিকারের একটি অভিনব বিকল্প। আর শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই সাধারণত বছরে এক হাজার কোটি ডলারের

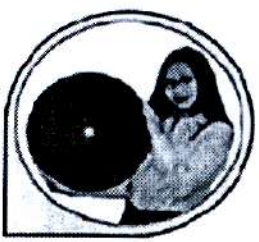

বেশি লাউডস্পিকার বিক্রি হয়। শব্দকে সরু বীমের আকারে প্রেরণের সুযোগ কিন্তু এ ক্ষেত্রে বহুরকমের নতুন সম্ভাবনার পথ খুলে দেবে। যেমন ধরুন বিমানের যাত্রীদেরকে এখন কানে হেডফোন লাগিয়ে মিউজিক শুনতে হয় বা সিনেমা দেখতে হয়। প্রত্যেক যাত্রীর কাছে তাঁর পছন্দসই শব্দ সরাসরি প্রেরণ সম্ভব হলে হেডফোনের আবশ্যকতা থাকে না। যেসব বার্তা ভিড়ের মধ্যেও আমরা শুধু এক জনকেই দিতে চাই, তা খুব স্পষ্টভাবে তাকে দেয়া যাবে, অথচ অন্য কেউ শুনবে না। অথবা গাড়ির কথাই ধরা যাক। ড্রাইভার চাচ্ছেন রেডিওতে পথঘাটের কথা শুনতে, যাত্রীদের একজন চাচ্ছেন ক্ল্যাসিকাল মিউজিক শুনতে, আর একজন পপ মিউজিক। প্রত্যেকে ভরা আওয়াজে যার-যারটি শুনতে পারবেন অন্যজনকে বিন্দুমাত্র বিরক্ত না করে!

এখন দেখা যাক কীভাবে এটি সম্ভব হল। সাধারণ অবস্থায় শব্দতরঙ্গ বিশেষ দিকে সরুরশ্মিতে পরিবাহিত হয় না, বরং তার উৎসবিন্দু থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণেই আমরা সব সময় শব্দসাগরে ডুবে আছি, আর এ কারণেই বাড়ির মিউজিক সিস্টেম থেকে মিউজিক শোনার জন্য আমাদেরকে এর ঠিক সামনে থাকতে হয় না, কাছাকাছি যে কোনো জায়গায় থাকলেই হয়। অবশ্য শব্দকে প্রয়োজনে বিশেষ দিকে একটু ভালোভাবে পরিচালিত করা যায়– যেমন কাউকে ডাকার সময় দুই হাতে টিউবের মতো বানিয়ে আমরা মুখের সামনে ধরি যেন শব্দটি তার দিকে বেশি যায়। কিন্তু তাই বলে একেবারে সরু বীমে এমনভাবে তো কখনো শব্দ কারো কাছে পাঠাতে পারি না যাতে সে শুনবে, কিন্তু আশপাশে আর কেউ কিছুই শুনবে না। সেটি কীভাবে সম্ভব?

আসলে সেটি সম্ভব কারণ প্রকৃতপক্ষে বিশেষ দিক-অভিমুখি হওয়াটাই শব্দের প্রকৃতি– আমরা সেটি লক্ষ্য করতে পারি না বলেই জানি না। কোনো দিক লক্ষ্য করে শব্দ সৃষ্টি করলে তা কৌণিকভাবে কতখানি ছড়িয়ে পড়বে তা নির্ভর করে শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর। তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত ছোট হবে শব্দ তত ছোট কোণে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে। সমস্যা হল আমাদের কানের যে শ্রবণসীমা তাতে আমরা শুধু ২ সেন্টিমিটার থেকে ১৭ মিটার পর্যন্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শব্দ শুনতে পাই। কিন্তু এর মধ্যে একেবারে ছোটগুলো ছাড়া শব্দের কৌণিক বিস্তার ৩৬০ ডিগ্রির মতো। এ জন্যই আমরা শ্রবণযোগ্য সব শব্দ চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে দেখি।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছাড়াও আর একটি বিষয় রয়েছে যা শব্দের কৌণিক বিস্তারকে প্রভাবিত করে। এটি হল এর উৎসের এপারচার, অর্থাৎ উৎস কত বড় মুখের মধ্য দিয়ে শব্দটি সৃষ্টি করে তার আকার। এ হিসাবে বড় লাউডস্পিকারের এপারচার বড় বলে সেটি অপেক্ষাকৃত ছোট জায়গায় তার শব্দকে ফোকাস করে। ছোট লাউডস্পিকারের

শব্দ নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা বেশি। বর্তমানের বড় লাউডস্পিকারগুলোকে যদি আরো কয়েক গুণ বড় করে নেয়া যায়, তাহলে অপেক্ষাকৃত সীমিত একটি বীমে শব্দকে পাঠানো সম্ভব। অবশ্য তাতে আমাদের উল্লসিত হবার কিছু নেই। কারণ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে যে সীমাবদ্ধতা উপরে বলা হয়েছে, তার বিচারে শ্রবণযোগ্য সবচাইতে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শব্দকেও বীমের আকারে পাঠাতে অন্তত ১০ মিটার ব্যাসের লাউডস্পিকার প্রয়োজন। আর দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শব্দ হলে তো তা কাজ করতে উঁচু দালানের সাইজের লাউডস্পিকার লাগবে।

কাজেই সরাসরি শ্রবণযোগ্য শব্দকে সরু বীমের আকারে পাঠানোর চেষ্টা করা বৃথা। এটি একমাত্র সম্ভব হতে পারে যদি প্রথমে আমরা শব্দকে অতিক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শ্রবণোত্তর শব্দে (আলট্রা-সাউণ্ড) পরিণত করে নিই। যদি মিলিমিটার আকারের শব্দতরঙ্গ ব্যবহার করতে পারি তা হলে মাত্র আধমিটার ব্যাসের লাউডস্পিকার থেকেই আমরা সরু বীমের শব্দ সৃষ্টি করতে পারি। অবশ্য কানে পৌঁছার আগে সেই শব্দকে শ্রবণযোগ্য শব্দে রূপান্তর করতে না পারলে কোনো লাভ নেই এমনি বীমের। মজার ব্যাপার হল শব্দ সরু বীমের এগিয়ে যাওয়ার সময় বাতাস নিজেই এই কাজ করতে পারে– শ্রবণোত্তর ক্ষুদ্র তরঙ্গের শব্দকে শ্রবণযোগ্য শব্দে রূপান্তরিত করার কাজটি। এটি যে ঠিক কীভাবে ঘটে সেটি গাণিতকভাবে বোঝা গেলেও এখনো পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। তবে এর মাধ্যমে যেন সরু বীমে শ্রবণোত্তর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটি চলন্ত লাউডস্পিকারও পরিবাহিত হচ্ছে যেখান থেকে শ্রবণযোগ্য শব্দ তৈরি হয়ে ভেসে আসছে স্থানীয়ভাবে। এটি তখন হয়ে পড়ে কার্যত একটি অতিদীর্ঘ লাউডস্পিকারের মতো যা অতিবড় লাউডস্পিকারের মতোই শব্দকে সরু বীমে রাখতে সক্ষম। ব্যাপারটি এমন দাঁড়ায় যে পূর্ণ আওয়াজের শব্দ বীম থেকে মাত্র দুই এক সেন্টিমিটার সরে গেলে নীরবতায় পড়তে হয়। এই ব্যাপারটি কিন্তু ভিন্ন একটি ক্ষেত্রে প্রথম লক্ষ্য করা হয়েছিল উনিশ শ' ষাটের দশকে। সমুদ্রতলে সোনার (Sonar) তরঙ্গ নিয়ে গবেষণার সময় দেখা যায় যে, ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলট্রা-সাউণ্ড যখন পানির ভেতর দিয়ে যায় তখন সেখান থেকে শ্রবণযোগ্য শব্দের সরু বীম তৈরি হয়ে যায়। এর গাণিতিক বিশ্লেষণের চেষ্টায় ১৯৬৫ সনে ব্রিটেনের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরহ্যান বার্কটে একটি সমীকরণ আবিষ্কার করেন। বার্কটের সমীকরণ অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে পানি আলট্রা-সাউণ্ডকে এক বিশেষ ভঙ্গিতে পরিবর্তিত করে যা বেশ জটিল হলেও গাণিতিকভাবে যার পূর্বাভাস দেয়া যায়। যেহেতু এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সরল রৈখিকভাবে ঘটে না এটি তাই অসরল (নন-লিনিয়ার) গাণিতিক সম্পর্কের অন্তর্গত, যার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে শব্দবিদ্যার একটি নতুন দিক, অসরল শব্দবিদ্যা (নন-লিনিয়ার একাউস্টিক্স)।

শুরুতে বিষয়টি পানির ভেতরে 'সোনার' গবেষণায় সীমাবদ্ধ ছিল। পরে বিজ্ঞানীরা বাতাসে এর ব্যবহার সম্ভাবনার দিকে আকৃষ্ট হলেন। বাতাসের মধ্য দিয়ে যখন আমরা শুনি শব্দের অসরল দিকটি আমাদের বোধগম্য হয় না। যেমন, একটি কনসার্ট শোনার সময় কাছ থেকে বা দূর থেকে শোনার মধ্যে আওয়াজের বড়-ছোট হতে পারে, কিন্তু তার মিউজিক শুনে কোনো তারতম্য মনে হয় না। শব্দের অসরল আচরণটি দুর্বল বলেই আমাদের এরকম মনে হয়, আসলে দূরে যাবার পথে এই আচরণের ফলে শব্দ ঠিক একই থাকে না।

পানির ভেতরে যা করা হয়েছিল যেভাবে শ্রবণোত্তর আলট্রা-সাউণ্ড টোন বাতাসে ছুঁড়ে দিয়ে দেখা গেছে যে, এদের পরস্পরের উপরিপাতনের ফলে শ্রবণযোগ্য টোন তৈরি হচ্ছে। এ পর্যায়ে বিশুদ্ধ টোনের ক্ষেত্রেই শুধু এটি পাওয়া গিয়েছে, কথাবার্তা বা মিউজিকের জটিল শব্দকে একই প্রক্রিয়ায় আনা যাবে কি না সেটি অবশ্য ভিন্ন প্রশ্ন। এরকম জটিল শব্দের মধ্যে থাকে বহুতরো ফ্রিকোয়েন্সি যাদের পরস্পর উপরিপাতনে অসংখ্যরকমের বিকৃতির সমাহার তৈরি হবার কথা। এ পর্যায়ে জাপানে ইলেক্ট্রনিক কোম্পানি রিকোর বিজ্ঞানি ইয়োনেয়ামা বুঝতে পারলেন যে, বহু ফ্রিকোয়েন্সির জটিল মিশ্রণের শব্দকেও আলট্রা-সাউণ্ডে পরিণত করার সোজাসুজি পদ্ধতি সম্ভব হতে পারে। তিনি যে পদ্ধতি এর জন্য ব্যবহার করলেন, রেডিও-প্রযুক্তির কারণে এটি আমাদের পরিচিত। এ হল এমপ্লিচিউড মড্যুলেশন যার কারণে রেডিয়োর সাধারণ ব্যান্ডগুলোকে আমরা এ,এম বলি। রেডিয়োর ক্ষেত্রে আমরা জটিল যে শব্দজাত সিগন্যালকে দূরে পাঠাতে চাই তাকে গুণ করে নিই বাহকতরঙ্গ নামক একটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির বিশুদ্ধ তরঙ্গের সঙ্গে। এর ফলে আমরা একটি সংকর রকমের তরঙ্গ পাই যেখানে সিগন্যাল মিশে থাকে বাহকের সঙ্গে। গন্তব্যস্থলে পৌছার পর রেডিও-গ্রাহকযন্ত্রে সিগন্যালকে বাহক থেকে আলাদা করে নেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে অবশ্য পুরো ব্যাপারটিই ঘটে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গরূপে যাকে পরে শব্দতরঙ্গে পরিণত করে নিতে হয়।

জটিল শব্দতরঙ্গকে আলট্রা-সাউণ্ডে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রেও এই একই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। এর ফলে আমরা পাব আলট্রা-সাউণ্ডের বাহকতরঙ্গের সঙ্গে শ্রবণযোগ্য শব্দতরঙ্গের একটি সংকর। আলট্রা-সাউণ্ড যথারীতি একে সরু রশ্মির আকারে সোজা লক্ষ্যস্থলে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু পথের মধ্যে বাতাসে থাকতে আরো কিছু ব্যাপার এটি ঘটায়। এমপ্লিচিউড মড্যুলেশনের একটি ফলশ্রুতি হল যে, এর ফলে দুটি নতুন ফ্রিকোয়েন্সিগুচ্ছের সৃষ্টি হয়– ব্যাণ্ড বা ফিতার মতো একটি অপ্রশস্ত রেঞ্জে যা ছড়ানো। এদের একটি সংকর তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি থেকে খানিকটা উঁচু ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জে, ও অন্যটি খানিকটা নিচু ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জে।

তাদের বলা হয় সাইডব্যাণ্ড। এই সাইডব্যাণ্ড দুটো সংকর তরঙ্গের সঙ্গে পরস্পর ক্রিয়া করে যা উৎপাদন করে তার একটি হল সংকর তরঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সেই মূল জটিল শব্দটিরই অনুকৃতি। ইয়োনেয়ামা চাইলেন এই অনুকৃতিটিকেই ব্যবহার করে সরু বীমের আকারে শ্রবণযোগ্য শব্দকে পেতে।

১৯৮৩ সনে জাপানি বিজ্ঞানীরা একটি বড় আলট্রা-সাউণ্ড স্পিকার থেকে সাধারণ শব্দের দ্বারা এমপ্লিচিউড মড্যুলেশন করা আলট্র-সাউণ্ড বীম পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। এই বীমের মধ্যে ঠিক ঐ সাইডব্যাণ্ডের বিক্রিয়াজাত মূল শ্রবণযোগ্য শব্দ তৈরি হতে তাঁরা শুনলেন। কিন্তু খুবই বড়রকমের বিকৃতিও একই সঙ্গে সৃষ্টি হচ্ছিল। শব্দের আওয়াজ যত বড় করা হল ঐ বিকৃতিও ততই অসম্ভব রকমের বেড়ে গেল। এর মধ্য থেকে মূল শব্দকে শোনা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, যদি তা সামান্য বড় আওয়াজেও শুনতে চাই।

ইয়োনেয়ামা তাঁর বিশ্লেষণমূলক কাজের মধ্যে যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে ভুল করেছেন তা হল সাইডব্যাণ্ডের কাজের ফলে সৃষ্ট আদি শব্দের মধ্যে দুটি অংশ থাকে– একটি অবিকৃত অংশ, এবং অন্যটি খুবই বিকৃত-হওয়া অংশ। আরো দুর্ভাগ্যের কথা হল আলট্রা-সাউণ্ডের ভল্যুম বাড়াবার সঙ্গে অবিকৃত অংশটির ভল্যুম সমানুপাতিকভাবে বাড়লেও বিকৃত অংশটির ভল্যুম বাড়ে গুণোত্তর হারে অতিদ্রুত। ফিসফিসানির মতো অতিনিম্ন আওয়াজে যদিও বা অবিকৃত অংশটি শোনা যায় এর উপরে গেলেই বিকৃত অংশের দাপটে মূল শব্দের কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। ফলে জাপানি বিজ্ঞানীরা হাল ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু হাল ছাড়লেন না এম আই টির মিডিয়া ল্যাবে বিজ্ঞানী পম্পেইয়ের নেতৃত্বে গবেষকদল। তাঁরা দেখালেন যে, অবিকৃত অংশটিকে গুরুত্ব দেয়াটাই ভুল হয়েছে। গুরুত্ব দিতে হবে বিকৃত অংশটিকে, দূর করতে হবে তার বিকৃতি।

সেই বার্কটের সমীকরণের ফলে সাইডব্যাণ্ড দুটার বিক্রিয়ার গাণিতিক পূর্বাভাস হুবহু দেয়া সম্ভব। কাজেই যেভাবে আমরা এমপ্লিচিউড মডিল্যুশন করে সংকর তরঙ্গ সৃষ্টি করেছি– যাতে বিকৃতি সৃষ্টি হয়েছে– বার্কটে সমীকরণের মাধ্যমে ঠিক তার উল্টোটা করে বিকৃতি দূরও করা যাবে। যদি আগে থেকে এরকম উল্টো বিকৃতি ঢুকিয়ে দেয়া যায় তাহলে স্বাভাবিক বিকৃতির সঙ্গে কাটাকুটি হয়ে আমরা সঠিক শব্দটিই পাব। একটি উপমা নিলে ব্যাপারটি ভালো বোঝা যাবে। তর্কের খাতিরে ধরা যাক একজন মানুষকে পিটিয়ে-পিটিয়ে অনেক সরু ও লম্বা করে ফেলা হল। লাফিং গ্যালারির কনকেভ আয়নার সামনে দাঁড়ালে সাধারণ মানুষকে হাস্যকর রকমের মোটা আর বেঁটে দেখায়। কিন্তু ঐ পিটিয়ে সরু ও লম্বা করা

মানুষকে ঐ আয়নার সামনে দাঁড় করালে তাকে আমরা ঠিক সে যা আগে ছিল সেই স্বাভাবিক আকারেই দেখব।

অবশ্য ওভাবে আসলটি খুঁজে পাওয়ার পরও একই সঙ্গে সেই পূর্বের অবিকৃত অংশটিও পাব। কিন্তু তখন উচ্চতর ভল্যুমে এর আর কোনো পাত্তাই থাকবে না। এই পদ্ধতিতে মোটামুটি বড় আওয়াজেও বিকৃতির পরিমাণ শতকরা পাঁচ ভাগে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। আরো বড় আওয়াজে আরো কম বিকৃতি রেখে পদ্ধতিটি অনুসরণের কাজ চলছে। বর্তমানের সবচেয়ে ভালো স্পিকারে খুব উচ্চ ভল্যুমেও বিকৃতি শতকরা এক ভাগের বেশি থাকে না। সফল হতে হলে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। তা ছাড়া আর একটি সমস্যা হল বার্কটে সমীকরণের মাধ্যমে উল্টো বিকৃতি দিতে গিয়ে অসংখ্য হার্মোনিক্সের জন্ম হয়- অবিকৃত শব্দ তৈরির জন্য যার সব কটাকে শব্দ বীমের ভেতর পরিচালিত করতে হয়। এর জন্য উপযুক্ত উচ্চ মানের স্পিকার সাম্প্রতিককালেই শুধু পাওয়া গিয়েছে।

এখন পুরো বিষয়টি ব্যবসায়িক সাফল্যের অপেক্ষায়। তাই প্যাটেন্ট করা এবং ব্যবসায়িক গোপনীয়তা রক্ষাটা প্রাধান্য পাচ্ছে বলে প্রযুক্তিটি শেষ পর্যন্ত কী অবস্থায় দাঁড়াবে এখনো বোঝা যাচ্ছে না।

নতুন পরমাণু-যুগ: ন্যানো-ইলেকট্রনিক্স

সবাই বলছে আগামী যুগ তথ্য-প্রযুক্তির। তথ্য-প্রযুক্তির ভিত্তি হল মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রনিক্স সার্কিটগুলোকে যেখানে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর পরিসরে রচনা করা সম্ভব হচ্ছে। যেমন, তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি গ্রাফিক্সগুলো হল ডিজিটাল লজিক সার্কিট। এই ক্ষুদ্রায়নের কাজটিতে এবার একটি বড় উল্লম্ফন ঘটতে যাচ্ছে। এইবার সার্কিট রচিত হবে অণু-পরমাণু দিয়ে আর তাই তার আকারও হবে অণু-পরমাণুর সাইজে– অর্থাৎ অনেক-অনেক গুণে ছোট। এ যেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি নতুন পরমাণু-যুগের সূচনা হতে যাচ্ছে।

ক্ষুদ্রায়নের কাজ সাম্প্রতিককালে যেভাবে চলছিল– তাতে এর মধ্যে একটি সীমারেখা চলে আসছিল। প্রতি বছরেই সিলিকন-প্রযুক্তি ভিত্তিক ইলেকট্রনিক্সে যন্ত্রপাতি আরো ক্ষুদ্র হয়ে আসছে বটে, কিন্তু এই গতিতে চললে আর সাত-আট বছরের মধ্যে তা তার নিম্নতম সীমায় পৌঁছে যাবে। আর বেশি ক্ষুদ্র একে করা যাবে না। কারণ এত ক্ষুদ্র অবয়বে গিয়ে সার্কিট আর কিছুতেই তার কারেন্টবাহী ইলেকট্রনগুলোকে ধারণ করে রাখতে সক্ষম হবে না।

কিন্তু উপরে বর্ণিত উল্লম্ফনেই এই সীমারেখা থেকে উদ্ধার পেয়ে আমরা ক্ষুদ্রায়নের ক্ষেত্রে একটি নতুন জগতে গিয়ে পৌঁছব। এতে এক লাফে সবকিছু আরো দশ লক্ষ গুণ ক্ষুদ্র হয়ে পড়বে। মাইক্রোর জগৎ থেকে আমরা ঢুকে পড়ব ন্যানোর জগতে– এটি হবে ন্যানো-ইলেকট্রনিক্সের যুগ। অঙ্কে 'মাইক্রো' কথাটির মানে $১০^{-৬}$, আর 'ন্যানো' কথাটির মানে $১০^{-৯}$, এর থেকে আরো দশ লক্ষ গুণ ছোট।

উত্তরণটি কেমন করে আসবে সে আলোচনায় যাওয়ার আগে দেখা যাক সাইজে ছোট হবার ব্যাপারটি আসলে কদ্দূর গড়াচ্ছে। বর্তমান কম্পিউটারগুলোতে মূল

যন্ত্রাংশ হল ট্রানজিসটর। এক-একটি কম্পিউটারে এখন একশ' কোটির মতো ট্রানজিসটর রয়েছে– ক্ষুদ্রায়নের বদৌলতেই এত বেশি সংখ্যা সত্ত্বেও আমাদের কম্পিউটারটি বেশ ছোটখাট ছিমছাম। ধরা যাক দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষের দশটি করে কম্পিউটার থাকবে। ঐ রকম একটি প্রসার পরিকল্পনার জন্য এক মিলিয়ন বিলিয়ন সংখ্যক ট্রানজিসটর প্রয়োজন হবে– সংখ্যাটি কত যে বড় ভাবাই মুশকিল। অথচ যদি ট্রানজিসটর না হয়ে ঐ যন্ত্রাংশটি হত একটি অণু তা হলে হাতের মুঠোতে রাখা একটুখানি পানিতেই অতগুলো অণু থেকে যেতে পারে। অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের আশা অনুযায়ী অণু-ভিত্তিক কম্পিউটার তৈরি হলে সারা দুনিয়ার সব মানুষের প্রত্যেকের দশটি করে কম্পিউটারের সবগুলো ঐ একটুখানি পানি সমান বস্তু দিয়েই তৈরি করা যাবে।

১৯৭৪ সালে আইবিএম কোম্পানির বিজ্ঞানী আর অভিরাম প্রথম অণু-ভিত্তিক ইলেকট্রনিক্সের সম্ভাবনার কথা প্রস্তাব করেন। কিন্তু এটি বাস্তবায়নের কাছাকাছি আসতে পেরেছে ১৯৯৬ সালের একটি বড় সাফল্যের মাধ্যমে। সাফল্যটি হল আণবিক তার তৈরি। ইলেকট্রনিক সার্কিটের সবচেয়ে মামুলি জিনিস হল তার, আর এদ্দিন আণবিক পর্যায়ে এই তারটুকুই তৈরি সম্ভব হচ্ছিল না। সালফার অণু সহযোগে অণু-তার তৈরি করে বিজ্ঞানীরা এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করতে সমর্থ হলেন ১৯৯৬ সালে। কার্বন-অণুর লম্বা শৃঙ্খলে তৈরি পলিফেনিলিন অণু এই তারের কাজ করল। সাধারণ অণুতে আণবিক বন্ধনের কাজে নিয়োজিত ইলেকট্রনগুলো সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে ওখানেই ঘুরপাক খায়। কিন্তু পলিফেনিলিন অণুতে এই কক্ষগুলো পরস্পরের উপর এমনভাবে উপুরিপাতিত হয় যে, এর ফলে অণুর দৈর্ঘ্য বরাবর বিদ্যুৎ পরিবাহিতার একটি চ্যানেল সৃষ্টি হয়। এখানে ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে একটি কারেন্ট পাওয়া যাবে– ঐ অণুরূপী তারের মধ্য দিয়ে।

তার হলেই তো আর বিদ্যুৎ-সার্কিট হয়ে গেল না– কার্যকর কিছু করতে গেলে প্রয়োজন লজিক সার্কিটের যার মধ্যে থাকে সুইচের কাজ করার উপাদান– সাধারণত যেটি ডায়োড দিয়ে করা হয়। ১৯৯৭ সালে অণু-ভিত্তিক ডায়োডও তৈরি হল। অণুর মধ্যেই এমন ব্যবস্থা হল যাতে কারেন্ট একদিকে অনায়াসে প্রবাহিত হতে পারে, কিন্তু অন্যদিকে পারে না; আর সেটাই তো ডায়োড। এটি করা হল ঐ পলিফেনিলিন তারের দু'টিকে একটি অপরিবাহী অণুর সঙ্গে যুক্ত করে। একটি তারের সঙ্গে যোগ করা হল মেথোক্সি অণু যা ইলেকট্রনকে ঠেলে তারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। অন্য তারের সঙ্গে যোগ করা হল সিরানো অণু যা তার থেকে ইলেকট্রন টেনে নেয়। এর ফলে কারেন্ট-প্রবাহ একদিকে অন্যদিকের চেয়ে অনেক বেশি সহজতর হল– যা কিনা ডায়োডের গুণ। এভাবে অণু-সাইজের ডায়োড পেয়ে যাওয়ার ফলে ঐ সাইজের লজিক-সার্কিট তৈরির কাজ সম্ভব হয়ে পড়ল।

ইতোমধ্যে অণু-সাইজের AND, NOT, XOR ইত্যাদি লজিক গেইট তৈরি হয়ে গেছে এবং কম্পিউটারে যার প্রয়োজন খুব বেশি সেই হাফ-এডারও তৈরি হবার পথে। যদিও বেশ কিছু ডায়োড দিয়ে এদের এক-একটি তৈরি– তবুও কিন্তু পুরো জিনিসটার অবয়ব ১০০ বর্গ ন্যানোমিটারের বেশি নয়– অর্থাৎ কিনা বর্তমানের সাইজের অন্তত দশ লক্ষ গুণ ছোট।

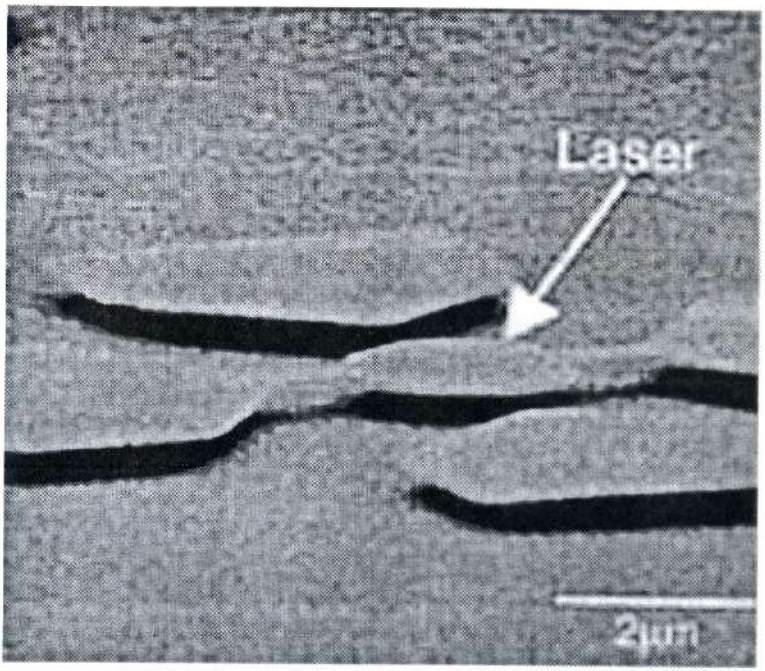

কম্পিউটারে দরকার লজিক গেইটের, আর দরকার মেমোরির। ওটিও দুরূহ কিছু নয়। ইচ্ছেমতো অন আর অফ করা যায় এমন অনেক সুইচের সমাবেশ ঘটালেই তা মেমোরির কাজ করতে পারে। লজিক তৈরিতে এ রকম সুইচ তো করাই হয়েছে, কাজেই মেমোরি পেতে বিলম্ব হয়নি। এখন অণু-সাইজের সহজ মেমোরি-ব্যবস্থা রয়েছে যেগুলোতে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্য ঢোকানো যায়, আর পুনরুদ্ধারও করা যায়। কম্পিউটারের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো তো হয়েই গেল– লজিক ও মেমোরি। তা হলে দেরীটা কিসের? অণু-সাইজের যন্ত্রাংশ দিয়ে অতি ক্ষুদ্র অবয়বের কম্পিউটার বাজারে আসতে বাধাটা কোথায়? সমস্যাটি রয়ে গেছে অন্যত্র।

এ পর্যন্ত যা বলা হল তাতে এক-একটি অণুর অবয়বে ইলেকট্রনিক সার্কিটের যন্ত্রাংশ সৃষ্টির সম্ভাব্যতা দেখা গেছে। অর্গানিক কেমিস্ট্রির উন্নত জ্ঞান প্রয়োগ করে এরকম কোটি-কোটি যন্ত্রাংশ সৃষ্টি অসম্ভব নয়। কিন্তু এদেরকে একত্র সন্নিবেশ করার সমস্যাটি কিন্তু থেকেই যায় এবং এটিই এখন বড় সমস্যা।

এ সমস্যার সমাধানের একটি উপায় হতে পারে স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করে। এতে থাকে খুবই সূক্ষ্ম একটি সূচাগ্র যা অণুকে ঠেলে এদিক-ওদিক নিতে পারে, এমনকি পরমাণুকেও পারে। ১৯৯০ সালে আইবিএম কোম্পানির বিজ্ঞানীরা এই কথা খুব নাটকীয়ভাবে প্রমাণ করেছেন ৩৫টি জেনন পরমাণুকে এমনভাবে একের পর এক সাজিয়ে যাতে করে I B M এই তিনটি অক্ষর ফুটে ওঠে– এর ইমেজের ছবিও ঐ মাইক্রোস্কোপে এসেছে। এভাবে সরাসরি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঠেলে নিয়ে ইচ্ছেমত অণু-সন্নিবেশ করাতে দু'টি আশংকা আছে। একটি হল কোনো-কোনো নাজুক অণু তলের সঙ্গে এমনভাবে লেগে থাকে যে তাকে ঠেলাঠেলি করলে ভেঙ্গে যাবার ভয় আছে। আবার কতগুলো এমন যে, ছুঁলেই ছুটে পালাতে চায়।

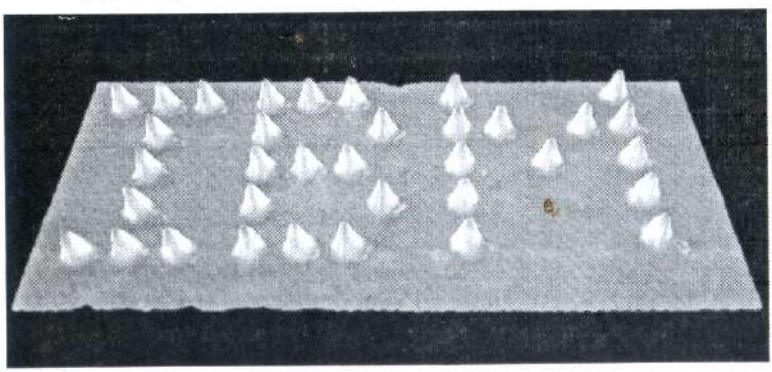

দ্বিতীয় সমস্যাটি হল সময় নিয়ে। এভাবে একটি-একটি করে অণু সাজাতে সময় লাগে। একটি পেন্টিয়াম চিপের সমমানের কাজে যেই এক কোটি অণু সাজাতে হবে তাতে কত সময় লাগবে আন্দাজ করুন। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন যে, এমন ব্যবস্থা করা যাবে, যাতে অণুগুলো নিজের থেকেই প্রয়োজনীয় সন্নিবেশে চলে আসবে। খুব সরল সার্কিটের ক্ষেত্রে এটি সম্ভব হয়েছে– জটিলতর ক্ষেত্রে কাজটি কঠিন হবে কোনো সন্দেহ নেই। তাছাড়া আরো সমস্যা রয়েছে।

এখনকার লজিক সার্কিটে সুইচ হিসাবে ট্রানজিসটর ব্যবহার করা হয়, যাতে বাইরের পাওয়ার উৎস থেকে শক্তি সরবরাহ করে এর হারিয়ে ফেলা শক্তির

ক্ষতিপূরণ করা যায়। অণুর অবয়বে যে সার্কিট তাতে ট্রানজিসটর তৈরির কৌশল এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। এটি না হওয়া পর্যন্ত অণু-পর্যায়ের কম্পিউটারে পাওয়ার বজায় রাখা সম্ভব নয়।

অতিমাত্রায় ক্ষুদ্রায়ন করতে গিয়ে আরো একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। আণবিক পর্যায়ের যে প্রসেসর তার যে আকার, তার কারেন্টের যে শক্তি এর সঙ্গে সাধারণভাবে ব্যবহার্য কি-বোর্ড, মনিটর-পর্দা ইত্যাদির সংযোগ সম্ভব নয়, কারণ এদের আকার, কারেন্ট সবই অন্য মাপের। সংযোগে এই সমস্যাটি সমাধান করতে হবে। তাছাড়া অণুরূপী যন্ত্রাংশসমূহের পরস্পরের মধ্যে সংযোগটিও সহজ নয়, আর এ রকম সংযোগের সংখ্যাটিও বিশাল– কোটি-কোটি। এতগুলো সংযোগে ভুল হবার সংখ্যাও হবে বড়– ফলে এ সব ভুলের সম্মিলিত প্রভাবে পুরো সার্কিটটি ভেস্তে যাবার সম্ভাবনা প্রচুর।

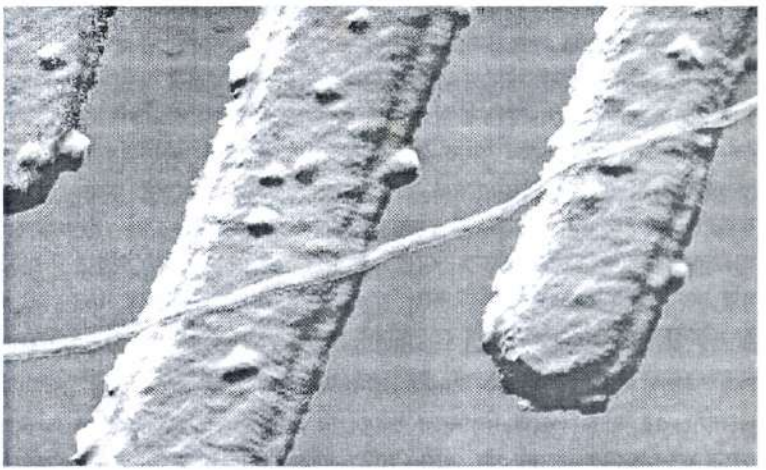

কম্পিউটার-সার্কিটের ক্ষেত্রে নতুন একটি ধ্যান-ধারণা এই সমস্যাগুলোকে পাশ কাটিয়ে যেতে সহায়ক হতে পারে। এই ধারণায় যদিও বা অনেকগুলো ভুল সার্কিটে থেকে যায়, কম্পিউটার নিজে দেখে নিতে পারে কোন যন্ত্রাংশগুলো নির্ভুল রয়েছে– ঐ নির্ভুল অংশগুলো ব্যবহার করে এখনো কম্পিউটার কাজ করে যেতে পারে। এভাবে কম্পিউটারকে ডিজাইন করা যেতে পারে, যাতে সে নিজেই নিজের ত্রুটিপূর্ণ অংশগুলোকে এড়িয়ে যেতে পারে। এর মতে ন্যানো-প্রযুক্তির কম্পিউটারগুলো নিজের মধ্যে বেশ কিছু ত্রুটি সহ্য করতে সক্ষম হবে। যেটি যত বেশি ত্রুটি সহ্য করতে পারবে, সেটি তৈরি তত কম ব্যয়বহুল হবে।

আরো একটি বড় সমস্যা নিহিত রয়েছে অতিরিক্ত ক্ষুদ্রায়নের মধ্যে। এটি হল তাপ সৃষ্টির সমস্যা। আজ আমরা যে কম্পিউটার চিপ ব্যবহার করছি ভবিষ্যতের ন্যানো-চিপের তুলনায় তা রীতিমত বিশালাকৃতি। কিন্তু এখানেও চিপের মধ্যে অসংখ্য কারেন্টের কারণে মোট তাপ উৎপাদনটি বেশ উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে। আর ন্যানো-সার্কিটে যে প্রসেসর হবে তা থাকবে আরো লক্ষ-লক্ষ গুণ বেশি ঘন সংবদ্ধভাবে। সেখানে উৎপন্ন তাপে পুরা জিনিসটি চুলার মতো উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে। সে অবস্থায় কোনো বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কাজ করতে পারে না। আশা করা হচ্ছে এরও উপায় একটি বেরুবে। এমন কোনো কায়দা আবিষ্কৃত হবে যা ঐ সার্কিটের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে থেকে অতিরিক্ত তাপটি নিরাপদে বের করে দেবে।

তবে তাপ সৃষ্টির সমস্যাটির একটি আরো বৈপ্লবিক সমাধানের কথাও চিন্তা করা হচ্ছে। তাপ সৃষ্টি হয় সার্কিটে কারেন্ট প্রবাহিত হলে। যদি আদৌ কোনো কারেন্ট না থাকে তা হলে সেই ল্যাঠা চুকে যায়। এখন বিজ্ঞানীরা ন্যানো–সার্কিটের জন্য এমন একটি ব্যবস্থার কথা ভাবছেন– যেখানে বৈদুতিক কারেন্ট থাকবে না– অর্থাৎ ইলেকট্রন ওখানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মোটেই নড়বে না। বরং সিগন্যাল প্রবাহিত হবে স্থৈতিক বৈদ্যুতিক আবেশের মাধ্যমে। একটি অণুর কাছে বৈদ্যুতিক চার্জ আনা হলে অণুর বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্যে পরিবর্তন ঘটবে। ঐ পরিবর্তনটাই এখানে সিগন্যালের কাজ করবে, কোনো কারেন্ট নয়। যেহেতু কারেন্ট থাকবে না, কাজেই কোনো তাপও থাকবে না। ইতোমধ্যেই মাইক্রোসার্কিটের মধ্যে স্থৈতিক বিদ্যুৎ নির্ভর ব্যবস্থা তৈরি সম্ভব হয়েছে। এটিই যদি আণবিক আকারের সার্কিটে নিয়ে যাওয়া যায়, তা হলেই হল। আর অণু যে স্থির-বিদ্যুতে প্রভাবিত হয় সেটি তো জানাই কথা।

স্থির বিদ্যুৎ ব্যবহারে একটি বাড়তি সুবিধাও পাওয়া যাবে–তা হল সিগন্যাল প্রসেসিং-এর গতি। ওতে সিগন্যাল চলাচলের গতি সাধারণ কারেন্টের তুলনায় বেড়ে যাবে অনেক-অনেক গুণ বেশি। সত্যি-সত্যি বিদ্যুৎ-গতি বলতে যদি কিছুকে বলতে হয় তবে স্থির-বিদ্যুৎ আবেশকেই তা বলা উচিত।

স্থির-বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় না গিয়েও তাপ-সৃষ্টির সমস্যাকে বাগে আনার অন্য উপায়ও ভাবা হচ্ছে। যেমন– অণু-পর্যায়ের সার্কিট এতই ক্ষুদ্র যে, ওকে খুব বেশি ঠাস-বুনোটে তৈরি না করেও প্রসেসরকে আজকের তুলনায় অনেক ছোট করা যাবে। দশ লক্ষ গুণ ছোট করার বদলে আমরা যদি এক লক্ষ গুণ ছোট করাতেই সন্তুষ্ট থাকি তা হলে প্রত্যেকটি অণু-যন্ত্রাংশ পরস্পর থেকে এত দূরে রাখা যাবে যে তাপ সৃষ্টিটি তেমন সমস্যা নাও হতে পারে। আর একটি সম্ভাব্য উপায় হতে পারে একে অপেক্ষাকৃত মন্থরগতিতে পরিচালনা করে। খুব ধীরে চালিয়েও ন্যানো-

প্রযুক্তির কম্পিউটারের যথেষ্ট কাজ পাওয়া যেতে পারে– যেমন পাওয়া যায় আমাদের মস্তিষ্কে। আমাদের মস্তিষ্কে নিউরোনগুলো কিন্তু বেশ ঢিমে তেতালা গতিতে কাজ করে। নিউরোন উদ্দীপ্ত হবার গতি সেকেন্ডে মাত্র ১০০ বার, যা কিনা আধুনিক কম্পিউটারের তুলনায় অন্তত ৫০ লক্ষ গুণ ধীর। কিন্তু তাতে মস্তিষ্কের চিন্তা-প্রক্রিয়ায় কোনো ব্যাঘাত ঘটে না বা কম্পিউটারের তুলনায় তা মোটেই নিম্ন মানের নয়– তার কারণ নিউরোনের সংখ্যা এত বেশি এবং তারা এত ঘনিষ্ঠ অবস্থানে কাজ করে যে, ধীর গতি সত্ত্বেও কাজ অনেক বেশি হয়। তা ছাড়া মস্তিষ্কের কাজ অনেক বেশি বিশেষায়িত। যেমন, সমান্তরালভাবে একই সঙ্গে এটি অনেকগুলো সিগন্যাল প্রসেস করতে পারে, যা আজকের সাধারণ কম্পিউটার পারে না। কাজেই অণু-পর্যায়ের প্রসেসরে ধীর গতিও অনেক কিছু সমাধা করতে পারবে। অথচ ধীর গতির অর্থ হল কম তাপ উৎপাদন।

অণু-পরমাণুই ভবিষ্যতে ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশের কাজ করতে পারবে এটি এখন সপ্রমাণিত। কিন্তু একে সম্ভব করতে হলে পথিমধ্যে অনেকগুলো সমস্যার সমাধান করে যেতে হবে, এটিও অবধারিত। তবে সমাধানগুলো অসম্ভব মনে হচ্ছে না। মনে হতে পারে অণুকে ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশে পরিণত করা, এরকম অনেকগুলোর সঠিক সমাবেশ ঘটিয়ে কার্যকর প্রসেসর গড়ে তোলা, এটি নিজেও একটি অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ কাজ। সেটি যে তাই তাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু সিলিকনের চিপের উপর আজকের মাইক্রোপ্রসেসর সৃষ্টির কাজটিও কি খুব সহজ-সরল কিছু? মোটেই না। আজ একে সহজ মনে হচ্ছে গত ৪০ বছর ধরে এটি নিয়মিত করা হচ্ছে বলে, এবং ক্রমাগত উন্নয়ন হয়ে এসেছে বলে। ন্যানো-প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও এক দিন এর কাঠিন্য ও জটিলতাকে আমরা দৈনন্দিন করণীয় কাজে পরিণত করতে পারব। ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের ভবিষ্যৎ একটি নতুন পরমাণু-যুগের অপেক্ষায় রয়েছে।

প্লাস্টিক আলো

একটি প্রযুক্তি এখন বেশ সম্ভাবনা নিয়ে আসছে তা হল পলিমার প্লাস্টিকে স্বল্প বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ প্রয়োগ করে তার থেকে বর্ণিল আলো নিঃসরণের ব্যবস্থা। প্লাস্টিক থেকে আলোর হালকা বিচ্ছুরণ শিগ্‌গির বহু রকম নমনীয় সাধারণ জিনিসে জ্বলজ্বলে রঙিন ছবি দেখার সুবিধা করে দিতে পারে। এমনকি টেলিভিশনকেও তখন পোশাক হিসাবে গায়ে পরলে বা দেখার পর ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিতে পারলেও আশ্চর্য হব না। এই মুহূর্তে অবশ্য এতখানি সম্ভব হয় নি। যেটুকু প্রয়োগ ঘটেছে তা হল মোবাইল ফোনের ছোট স্ক্রীনটাকে আলোকিত করে তোলার জন্য একখণ্ড হালকা পাতলা প্লাস্টিক ব্যবহার করলেই এখন চলছে- যাতে ব্যাটারীর সাশ্রয় হয়, ওজনেরও সাশ্রয় হয়। তবে সম্ভাবনা কিন্তু একে ছাড়িয়ে অনেক অনেক বেশি। এমন কী সৌরশক্তি থেকে অল্প বিদ্যুতে আমাদের পল্লী কুটিরে আলো জ্বালাতেও এর একটি ভূমিকা থাকতে পারে।

যেই কৌশলে প্লাস্টিকের মধ্য থেকে আলো নিঃসরণের ব্যবস্থা হচ্ছে মূলত সেমিকণ্ডাক্টর পদার্থের কৌশল। অনেক রকম যন্ত্রপাতিতেই আলোক সংকেত ফুটিয়ে তোলার জন্য এল ই ডি অর্থাৎ লাইট এমিটিং ডায়োড ব্যবহার করা হয়। প্রথম দিকের পকেট-কালকুলেটর, ডিজিটাল ঘড়ি ইত্যাদিতেও সংখ্যা প্রদর্শনের যে উজ্জ্বল ব্যবস্থা থাকত তাও অনেকগুলো এলইডি'র সমন্বয়ে তৈরি হত–আজও অনেক ক্ষেত্রে তাই হয়। এল ই ডি একটি ইলেকট্রনিক কৌশল যা অন্য সেমিকণ্ডাক্ট ও ডায়োডের সমতুল্য। এতে সাধারণভাবে পরিচিত ইনঅর্গানিক সেমিকণ্ডাক্টও ব্যবহার করা হয়, যেমন গ্যালিয়াম আর্সেনাইড। একটি সেমিকণ্ডাক্টরকে স্বল্প পরিমাণ এক রকম ভিন্ন পরমাণু ঢুকিয়ে তাতে বিদ্যুৎ বাহক ইলেকট্রনের পরিমাণ

বাড়িয়ে নেয়া যায়। তখন এগুলোকে বলা হয় এন-টাইপ বা নেগেটিভ টাইপ। আবার অন্য রকম ভিন্ন পরমাণু ঢুকিয়ে এতে বিদ্যুতবাহক 'হোল'-এর (গর্তের) পরিমাণ বাড়িয়ে নেয়া যায়। ইলেকট্রনের নেগেটিভ চার্জের বিপরীতে এক্ষেত্রে হয় হোলের পজিটিভ চার্জ (আসলে হল হলো ইলেকট্রন সমুদ্রে ইলেকট্রনের অভাব)। এই সেমিকণ্ডাক্টরকে তাই বলা হয় পি টাইপ বা পজিটিভ টাইপ। পি টাইপ ও এন টাইপ বস্তু দিয়ে যদি একটি স্যাণ্ডউইচ তৈরি করা হয় আর তাতে ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয় তা হলে ভোল্টেজের প্রভাবে বিদ্যুৎবাহক ইলেকট্রন যাবে এক দিকে, হোল যাবে অন্য দিকে। যাত্রাপথে যদি একটি হোলের সঙ্গে একটি ইলেকট্রনের দেখা হয় তবে তারা দুইয়ে মিলে একটি ঘটনা ঘটায়। ইলেকট্রন যখন হোলের (গর্তের) মধ্যে পড়ে যায় তখন হোলও বিলুপ্ত হয়, ইলেকট্রনও বিলুপ্ত হয়, বিনিময়ে কিছু শক্তি নিঃসরিত হয়। অধিকাংশ সেমিকণ্ডাক্টরে, এমনকি সর্বাধিক ব্যবহৃত সিলিকনেও, এই শক্তি তাপরূপে দেখা দেয় আর ঐ বস্তুকে গরম করা ছাড়া তার আর কোনো কাজ থাকে না। কিন্তু অন্য কিছু সেমিকণ্ডাক্টরে নিঃসরিত শক্তির তরঙ্গ-দৈর্ঘ এমন থাকে যে তা আলো হিসেবে নির্গত হয়। ব্যাপারটি নির্ভর করে ইলেকট্রনের ও হোলের শক্তিমাত্রার পার্থক্যের উপর। এই পার্থক্যের পরিমাণের উপরেই আলোর বর্ণও নির্ভর করে।

সঙ্গত কারণেই এই ডায়োডগুলোর নাম হয়েছে এল ই ডি বা লাইট এমিটিং ডায়োড (আলোক-নিঃসরী ডায়োড)। এল ই ডি'র বড় সুবিধা হল সাধারণ বাতিতে যে বিদ্যুৎ খরচে যে আলো পাওয়া যায়, এতে তার একটি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও লাগে না। তাছাড়া এল ই ডি'র স্থায়ীত্বও অনেক অনেক বেশি। তবে এল ই ডি ক্ষুদ্রাকার হয়। তা সত্ত্বেও ট্রাফিক বাতির মতো বড় ব্যবহারেও অনেকগুলো এলইডি একত্র করে ব্যবহার করাটা সুবিধাজনক। আমাদের দেশেও এখন তা হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হল এল ই ডি তো সাধারণ ইনঅর্গানিক সেমিকণ্ডাক্টারের ব্যাপার, এবং তা দিয়েই এগুলো দিব্যি চলছে। সেখানে প্লাস্টিকের ভূমিকা কী ? প্লাস্টিকের প্রয়োজনও বা হল কেন?

বছর দশেক আগে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের বিখ্যাত ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবোরেটরীতে খানিকটা বেখেয়ালেই আবিস্কৃত হয়েছিল যে পলি-ফিনাইলিন ভিনাইলিন নামের বিশেষ একটি প্লাস্টিকে পাতল পর্দার দুদিকে ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে তার থেকে ফ্যাকাশে এক হলুদ-সবুজ আলো নির্গত হয়। দশ বছরের গবেষণার পর এখন এই আবিষ্কারই সম্ভাবনার নানা দিক খুলে দিয়েছে।

প্লাষ্টিক সাধারণত বিদ্যুৎ পরিবাহী নয়। কিন্তু কনজুগেটেড পলিমার নামক এক বড় গোষ্ঠির প্লাস্টিক বিদ্যুৎ পরিবহন করে। সাধারণ পলিমার প্লাস্টিকে কার্বন পরমাণুগুলোর বাইরের চারটি ইলেকট্রনের প্রত্যেকটি আর একটি করে কার্বন পরমাণুকে ধরে রাখতে কাজ করে। অর্থাৎ এদের রয়েছে চারটি সিঙ্গেল বণ্ড। কিন্তু এই বিশেষ পরিবারে একটি কার্বনের বাইরের দু'টি ইলেকট্রনই নিয়োজিত থাকে প্রতিবেশী আর একটি কার্বন পরমাণুকে ধরে রাখতে অর্থাৎ কিনা তার ডাবল বণ্ড, অন্য কার্বন পরমাণুকে ধরার জন্য ইলেকট্রনগুলোর সময়কে সে ভাগাভাগি করে কিছুটা এখানে কিছুটা সেখানে দেয়। এরই ফলে এসব প্লাস্টিকে চলমান ইলেকট্রনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পরিবহনের সুবিধা হয়ে যায়। কার্বন চেইনের এসব ইলেকট্রনের সঙ্গে আরো কিছু ইলেকট্রন যোগ করে একে এন টাইপে পরিণত করা যায়। আবার কিছু ইলেক্ট্রন সরিয়ে ফেলে, ওর মধ্যে হোল সৃষ্টি করে, তাকে পি টাইপে পরিণত করা যায়। যথারীতি পি টাইপ আর এন টাইপ পলিমারের স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে এলইডি'র মতোই ভোল্টেজ প্রয়োগে তার থেকে আলো নিঃসরণ সম্ভব হয়েছে।

ইনঅর্গানিক সেমিকণ্ডাক্টরের এল ই ডি'র বদলে পলিমারে একই ঘটনা ঘটিয়ে কী লাভ? লাভ অনেক। যে এল ই ডি'র সঙ্গে আমরা পরিচিত সেগুলো তৈরি হয় বেশ দামি অত্যন্ত বিশুদ্ধ এবং কোলাসিত সেমিকণ্ডাক্টারের ছোট টুকরা দিয়ে। অথচ পলিমারের ক্ষেত্রে এমনটি হবার প্রয়োজন নেই। ত ছাড়া প্লাস্টিক তৈরি হয় ঘন চটচটে সিরাপের মতো তরলকে জমিয়ে যে কোনো আকৃতি দিয়েই তাকে তৈরি করা যায়। এর সঙ্গে যে কোনো সাইজের ইলেকট্রোডও সংযুক্ত করা যায়। তা ছাড়া ইনঅর্গানিক সেমিকণ্ডাক্টরগুলোতে ইলেকট্রন আর হোলের শক্তিমাত্রা সুনির্দিষ্ট বলে এদের থেকে মাত্র দু'একটি বর্ণের আলো পাওয়া সম্ভব। কিন্তু একই প্লাস্টিকে সামান্য কিছু রদবদল করে নানা বর্ণের আলো পাওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে ইলেকট্রন ও হোলের শক্তিমাত্রার পার্থক্য নির্ভর করে কার্বন-চেইনের মধ্যে ইলেকট্রনকে ভাগাভাগি করে ব্যবহারের পরিমাণের উপর। এই চেইন থেকে যে হাইড্রোজেন পরমাণু ঝুলতে থাকে তাকে অন্য কোনো জটিলতর পরমাণু দিয়ে বদলিয়ে নিলে তা ক্ষেত্রে বিশেষে ইলেকট্রনকে বেশি আটসাটভাবে বা ঢিলাভাবে ব্যবহার করবে। এভাবে পলিমারকে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রধান যে কোনো বর্ণ এবং তাদের মাঝামাঝি অন্য যে কোনো বর্ণের আলো দেবার মতো করে তৈরি করে নেয়া যায়।

সমস্যাটা হল প্রথম যেভাবে এই আলো পাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তাতে আলোর পরিমাণটুকু ছিল খুবই কম। পলিমারে ঢোকানো অধিকাংশ ইলেকট্রন আলো তৈরিতে কাজে আসত না, আসত শুধু তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। তাছাড়া এগুলো খুব বেশি

স্থায়ীও হতো না। কিন্তু গবেষণার ফলে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এখন এর থেকে আলোকপ্রাপ্তির দক্ষতা বেড়ে গেছে অনেক গুণে। স্থায়ীত্বও বেড়েছে অনেক। চ্যাপ্টা বড় একটি প্যানেলকে আলোকিত করার যত ব্যবস্থা বর্তমানে রয়েছে তার মধ্যে এই প্লাস্টিক আলোই সব চেয়ে স্বল্প ব্যয়ের।

বয়ে নিয়ে বেড়ানো হয় এমন যন্ত্রপাতিতে আজকাল সব চেয়ে কম বিদ্যুৎ খরচে লেখা ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলার (ডিসপ্লে) ব্যবস্থা হল লিকুইড ক্রিস্টাল ব্যবস্থা- যা ডিজিটাল ঘড়ি, কালকুলেটর, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ কম্পিউটার ইত্যাদিতে এখন অতি পরিচিত। কিন্তু এই ডিসপ্লে নিজে উজ্জ্বল নয়, তাই এর প্যানেলকে সামান্য আলোকিত করার জন্য পটভূমি-আলোর দরকার। লিকুইড ক্রিস্টাল নিজের জন্য তেমন বিদ্যুৎ খরচ না হলেও এই পটভূমি আলোর জন্য - কিন্তু বিদ্যুৎ খরচ কম নয়। আসলে বহনক্ষম যন্ত্রপাতিতে রিচার্জেবল ব্যাটারির পাওয়ার সাশ্রয়ের পথে এটিই বড় অন্তরায়। এই গুরুতপূর্ণ ব্যবহারটিতেই প্লাস্টিক আলোর প্রথম বাস্তব প্রয়োগ ঘটেছে। এতে আর একটি বড় সুবিধা হল অন্যভাবে আলোর ব্যবস্থা করতে যে ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম তার ওজনটি ঐ বয়ে বেড়াবার যন্ত্রের ওজন বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দেয়। প্লাস্টিক আলোতে সে রকম ওজন বলতে তেমন কিছু নেই। মোবাইল ফোনের ডিসপ্লেতে পটভূমি-আলো যোগাতেই প্লাস্টিক আলোর প্রথম বাণিজ্যিক ব্যবহার ঘটেছে।

কিন্তু স্পষ্টত এটি শুরু মাত্র, প্লাস্টিক আলোর ব্যবহার এতে সীমাবদ্ধ থাকবে না। পরবর্তী ধাপ হল এর মাধ্যমে উজ্জ্বল ছবির (ডিসপ্লে) ব্যবস্থা করা। তা করতে হলে প্লাস্টিক প্যানেলকে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র 'পিক্সেলে' ভাগ করে নিতে হবে যার প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে জ্বলা-নেভা করানো যাবে বৈদ্যুতিক সংকেতের সাহায্যে। সারি-সারি অসংখ্য পিক্সেলের সমন্বয়ে তখন ছবিটা ফুটে উঠবে। তখন প্লাস্টিক আলো শুধু ছবির পটভূমি হবে না, নিজেই ছবি হবে।

এরপর প্রশ্ন উঠবে রঙিন ছবির। এতেও মৌলিক কোনো অসুবিধা নেই- কারণ লাল, সবুজ আর নীল রং সৃষ্টি করতে পারলে এদের সমন্বয়েই সব রঙে গড়া রঙিন ছবি পাওয়া সম্ভব। তবে তরল থেকে ঢালাই করে অনায়াসে প্লাস্টিক প্যানেল তৈরি করার যে সুবিধা এক্ষেত্রে তা পাওয়া যাবে না। কারণ লাল, নীল ও সবুজ- এ রকম তিন রকম পিক্সেল সারা প্যানেল জুড়ে জড়াজড়ি করে থাকতে হবে তিন রকম প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি এই প্যানেলে। এতে একটানা ঢালাইয়ে সুযোগ নেই। সেখানে কাজটা করতে হবে আধুনিক চিত্রশিল্পীর মতো যিনি বিভিন্ন রঙের ছোট ছোট বিন্দু ব্যবহার করে পুরো ছবি গড়ে তোলেন। এ কাজটি করবে ইন্‌ক জেট প্রিন্টারের মতো যন্ত্র দিয়ে। এ ক্ষেত্রে কালির বদলে থাকবে পলিমার

তরল। বর্তমানে কম্পিউটার ইনক জেট প্রিন্টারের যে সূক্ষ্ম ক্ষমতা তাতে মাত্র ৩০ মাইক্রোমিটার দূরত্বে আলাদা-আলাদা পিক্সেল দিয়ে প্যানেলকে খচিত করা সম্ভব। এর দ্বারাই সৃষ্টি করা যাবে বেশ উচ্চ-রেজ্যুলেশনসম্পন্ন ছবি।

তবে আরো একটি আশা রয়েছে প্লাস্টিক আলোর ভবিষ্যৎ কারিগরদের মনে। শুধু অল্প খরচে হালকা পাতলা প্যানেলের মধ্যে উচ্চ মানের উজ্জ্বল ছবি সৃষ্টিই নয়- পুরো জিনিসটা হবে একেবারে নমনীয়- কাপড় বা সিলোফেনের মতো। প্লাষ্টিক নিজে যে নমনীয় হবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই- ওটিই তো প্লাস্টিকের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ডিসপ্লে হিসেবে ব্যবহার করতে হলে তার সঙ্গে যে ইলেকট্রনিক অংশগুলো থাকবে যা পিক্সেলগুলোতে যথাযথ সংকেত যোগাবে তার কী হবে? কাপড়ের মতো নমনীয় হলে পুরো সব কিছুকেই তো তা হতে হবে। এখন বিদ্যুৎপরিবাহী প্লাস্টিকের গবেষণায় অগ্রগতির ফলে সবকিছুকেই নমনীয় আকারে পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর মানে কাপড়, থলে, বোতল, আসবাব- যা কিছুই হোক না কেন যে কোনো আকৃতিতে যে কোনো ধরনের নমনীয়তায় উজ্জ্বল ছবির এমনকি চলমান ছবির সংযোজন তাতে সম্ভব। এর কল্যাণে আগামী দিনে পোশাকের ফ্যাশানে যদি এমনি উজ্জ্বল চিত্র সন্নিবেশিত হয় তা হলে অবাক হবার কিছু নেই। ট্রাফিক পুলিশ, ফায়ার বিগ্রেড ইত্যাদির কাজে যেখানে পোশাক দূর থেকে দেখা যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে সেখানে এটি খুবই উপকারেও আসবে। আরো মজার জিনিস হবে নমনীয় টেলিভিশন। যে কোনো পরিস্থিতিতে এটি ব্যবহার করা যাবে, দেখার পর আবার ভাঁজ করে রেখেও দেয়া যাবে ড্রয়ারে বা পকেটে!

হালকা হওয়া, নমনীয় হওয়া, ফ্যাশন-দুরস্ত হওয়া এসবের আকর্ষণ সবখানে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে গ্রামের কোটি-কোটি মানুষ এখনো বিদ্যুৎ থেকে দূরে তাদের জন্য প্লাস্টিক আলোর সব চেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল স্বল্প বিদ্যুৎ খরচে কিছু মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার সম্ভাবনা। বিকল্প বিদ্যুৎ সরবরাহের যে ব্যবস্থা এখন এসব দেশে দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে সৌর বিদ্যুৎ। এতে সূর্যের আলোর দ্বারা যেটুকু বিদ্যুৎ দিনের বেলায় তৈরি হয় তাকে স্টোরেজ ব্যাটারিতে জমিয়ে রাখা হয় রাতের ব্যবহারের জন্য। এ রকম বিদ্যুতের অনেক সুবিধা থাকলেও এর প্রাপ্তি কিন্তু স্বল্প, তাই হিসেব করে খরচ করতে হয়। যেমন যে বাতিতে এটি ব্যবহার করা হয় সে বাতিকে হতে হয় খুব দক্ষ– সাধারণত ফ্লোরোসেন্ট বাতি, বা আরো ভালো এর দক্ষতর রূপ কম্প্যাক্ট ফ্লোরোসেন্ট। কিন্তু তাও বেশিক্ষণ জ্বালানো সম্ভব নয়।

গ্রামের বাড়িতে কিছু স্বল্প আলো দরকার হয় ঘরকে বা বারান্দাকে সারারাত সামান্য আলোকিত করে রাখতে। যদি খুব অল্প বিদ্যুৎ খরচে এ রকম বাতি জ্বালানো যেত তা হলে সৌরবিদ্যুতে সেটি সম্ভব হত। ছাত্রদের রাতে অনেক্ষণ পড়ার জন্যও স্বল্প আলোর ব্যক্তিগত বাতি থাকলে মন্দ হত না। এখন ইনঅর্গানিক সেমিকণ্ডাক্টরে তৈরি স্বাভাবিক এল ই ডি'র একটি উন্নত রূপ পাওয়া যাচ্ছে যাকে বলা হয় হোয়াইট (সাদা) এল ই ডি। অন্যগুলোর তুলনায় এই এল ই ডির আলো প্রদানের ক্ষমতা অনেকটা বেশি এবং তা পরিষ্কার সাদা আলো। অথচ এল ই ডিগুলো অবশ্য খুব ছোট্ট এবং তার আলোও সীমিত। কিন্তু কয়েকটি একত্র করে বাতি তৈরি করা যায়– যা এক্ষেত্রে খুবই কাজে আসবে। হোয়াইট এল ই ডি'র সমস্যা হল এর দাম এবং অনেকগুলোকে একত্র করার প্রয়োজনীয়তা। প্লাস্টিক আলোর উজ্জ্বলতা যদি প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ কম রেখে বাড়ানো যায় তা হলে এক্ষেত্রে চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সাইজের প্লাস্টিক প্যানেলের আলোতে এখন তৈরি হতে পারবে পল্লী-কুটিরের সার্বক্ষণিক আলো, ছাত্রদের জন্য পড়ার আলো ইত্যাদি। সবই হবে খুব অল্প বিদ্যুতে যা অনায়াসে সৌরবিদ্যুৎ থেকে আসতে পারে।

ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ ব্যবস্থা : ফুয়েল সেল

বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ বোধ হয় ক্ষুদ্রের হাতে, বৃহতের হাতে নয়। ক্রমেই এই সত্য সারা দুনিয়ার কাছে হচ্ছে, আর বেশি করে হচ্ছে আমাদের মতো উন্নয়শীল দেশে– যেখানে বৃহতের চিন্তা সুদূরপরাহত, আর এই অবধি বিদ্যুৎ পৌঁছেছে জনসংখ্যার ছোট ভগ্নাংশের কাছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের দক্ষতা কিন্তু বরাবর বৃহৎ আকারে উৎপাদন ও বিতরণের মাধ্যমেই অর্জন করা যায় বলে ধারণা করা হয়েছে। উৎপাদন-দক্ষতার ক্ষেত্রে কথাটি সত্য। কারণ যত বড় বিদ্যুৎ-জনন কেন্দ্র হবে তত কম জ্বালানী খরচ করে এক একক বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি করা সম্ভব হবে। কিন্তু সবার কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর কথাটি যদি চিন্তা করা হয় তা হলে এরকম বড় আয়োজনকে আজ খুব সুবিধাজনক মনে করা হচ্ছে না। তাছাড়া আরো কারণ রয়েছে। যে কারণে ছোট আকারে, এমনকি ক্ষুদ্রাকারে এর উদ্যোগ নেয়ার জন্য বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থা আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।

একটি কারণ সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান বাজার-অর্থনীতিতে বাণিজ্যে উদার নীতি অবলম্বনের ফলে। বিদ্যুৎ সরবরাহ এখন বিশ্বের অনেক দেশেই আর সরকারের একচেটিয়া দায়িত্ব নয়– বাণিজ্যিকভাবে এতে অনেকের অংশ গ্রহণের সুযোগ হয়েছে। যেখানে প্রয়োজন, সেখানকার সুবিধা অনুসারে অপেক্ষাকৃত ছোট উদ্যোগের মাধ্যমে চাহিদা মেটানো এখন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হয়ে উঠছে। উৎপাদন-খরচ যদিও বা তুলনামূলকভাবে বেশিও হয় ভোক্তার কাছে পৌঁছানোর হিসাবে এটি বেশি হয় না। তাছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনকে কলকারখানার মেশিনের সৃষ্ট শক্তির উপজাত হিসাবে আনলে যে কোজেনারেশন হয়, তাতে বিদ্যুৎ ও উত্তাপ উভয়কে ব্যবহার করার ফলে লাভজনকতা বাড়ে।

দ্বিতীয় কারণটি হল পরিবেশজনিত। অতীতের বড় বড় বিদ্যুৎজনন কেন্দ্রগুলো সাধারণত কয়লা বা তেল দ্বারা পরিচালিত। এর যে বর্জ্য গ্যাস নিঃসরণ তা আজকের পরিবেশ-সচেতন বিশ্বের কাছে অসহনীয়। এর উপর বিভিন্ন বিধি-নিষেধ তখন আরোপ হয়েছে। অপেক্ষাকৃত বিকেন্দ্রীকৃত যে সব বিকল্প বিদ্যুতের সম্ভাবনা এখন উজ্জ্বল হচ্ছে তাতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস নিঃসরণের প্রশ্ন কম ওঠে। এদের যেগুলোর মধ্যে আদৌ ক্ষতিকর কিছু নিঃসরণ হয় তাও প্রাকৃতিক গ্যাসে পরিচালিত– যা ফসিল জ্বালানীর মধ্যে সব চেয়ে বেশি দূষণমুক্ত।

তৃতীয় আর একটি কারণ বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি হল নির্ভরযোগ্যতার প্রশ্ন। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎপ্রাপ্তি এখানে বড়ই দুর্লভ ব্যাপার– পাওয়ার কাট বা লোড শেডিং-এর কারণে। দেশের সব অঞ্চল বা বিশাল অঞ্চল একই গ্রিডের অধীন বলে যে কোনো জায়গার দুর্ঘটনা, ঘাটতি ইত্যাদি অন্য যে কোনো জায়গায় বিদ্যুতের অভাব ঘটাতে পারে। পুরোটা সামাল দেবার মতো সুব্যবস্থাপনা না থাকলে সবারই দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। স্থানীয় ব্যবস্থায় এটি ঘটবে না। নিজেরটা নিজে সামাল দেবার সুযোগ রয়েছে বলে সেখানে ভোক্তারা চাইলে নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে পারেন।

এসব কারণের ফলে এখন ছোট, দূষণহীন, নির্ভরযোগ্য এবং স্বল্পব্যয় বিদ্যুৎ সরবরাহের সমাদর বাড়ছে, আর এর জন্য গবেষণা, প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং বাণিজ্যিক উদ্যোগ বাড়ছে। বিকল্প বিদ্যুৎ-ব্যবস্থার মধ্যে সৌর বিদ্যুৎ, বায়ু-বিদ্যুৎ ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিচিত– কারণ ইতোমধ্যেই এদের বেশ কিছু প্রসার ঘটেছে। কিন্তু আরো কিছু প্রযুক্তি খুব শিগ্‌গির ব্যাপকতা লাভ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। তার মধ্যে ফুয়েল সেল প্রযুক্তি নাটকীয়ভাবে মঞ্চ দখল করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

ফুয়েল সেলের বিচরণ ঘটবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে। রাস্তায় মোটর গাড়িতে বর্তমান অন্তর্দহন ইঞ্জিনের বদলে ভবিষ্যতে ফুয়েল সেলের আবির্ভাব হবে বলে অনেকে মনে করেন। তেমনি বিকেন্দ্রীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ফুয়েল সেল বড় ভূমিকা নেবে। হাইড্রোজেন গ্যাসকে বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়ে ফুয়েল সেল শক্তি উৎপাদন করে। বেশ কয়েক ধরনের ভিন্ন রূপে থাকলে সব ফুয়েল সেলেই একটি এনোড ও একটি ক্যাথোড– এই দু'টি ইলেক্ট্রোড থাকে যার মাঝখানে থাকে একটি ইলেক্ট্রোলাইট (অনেকটা সাধারণ বিদ্যুৎ-কোষের মতোই)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এনোডে হাইড্রোজেন সরবরাহ করা হয়। এখানে হাইড্রোজেন-পরমাণু প্রোটন আর ইলেকট্রনে বিশ্লিষ্ট হয়– প্রোটন চলে যায় ইলেক্ট্রোলাইটের মধ্য দিয়ে ক্যাথোডে আর ইলেকট্রন যার তারের ভেতর দিয়ে যেখানে বিদ্যুৎ

সরবরাহ করতে হবে সেখানে, তারপর বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে কাজ করে এটি ফেরৎ আসে আবার সেলে। ক্যাথোডের মধ্যে প্রোটন আর ইলেকট্রন বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে পানি তৈরি করে। তাই সাধারণতঃ ফুয়েল সেলের একমাত্র বর্জ্য হল স্রেফ পানি– পরিবেশবাদীদের জন্য এর চেয়ে বড় সুখবর আর কী হতে পারে।

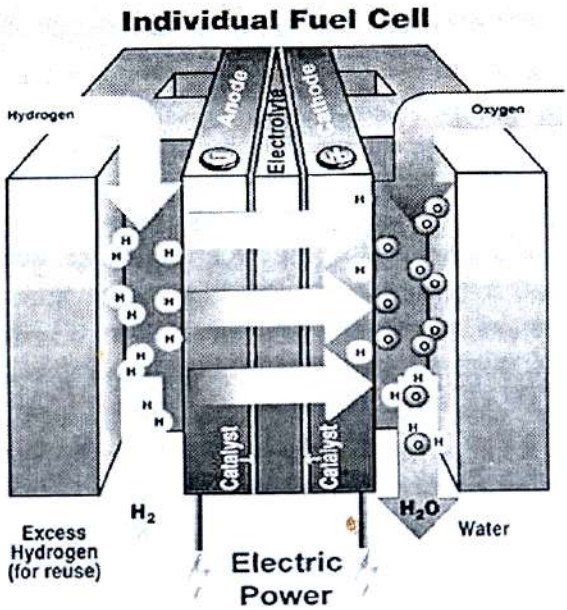

এই মুহূর্তে ফুয়েল সেল প্রযুক্তির মধ্যে অগ্রণী প্রযুক্তি হল প্রোটন এক্সচেঞ্জ মেমব্রেন (পি.ই.এম.)। এতে ইলেক্ট্রোলাইট হিসাবে ব্যবহার করা হয় একটি পলিমার ঝিল্লি (মেমব্রেন) যার গায়ে প্লাটিনাম মাখানো থাকে। এতে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তার জন্য প্লাটিনাম অনুঘটকের (ক্যাটালিস্ট) কাজ করে। ব্যালার্ড পাওয়ার সিস্টেম নামক একটি কানাডিয়ান কোম্পানি ১ কিলোওয়াট পাওয়ারের পি.ই.এম. সেল শিগ্‌গির বাজারজাত করতে যাচ্ছে। এটি বাড়ির বিদ্যুতের জন্য ব্যবহৃত হবে এবং হাইড্রোজেন জ্বালানী ব্যবহার করবে।

হাইড্রোজেন সর্বত্র সহজলভ্য নয় বলে এই কোম্পানি অন্য একটি মডেলও বাজারজাত করার কথা ভাবছে। এতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হবে। তবে

প্রাকৃতিক গ্যাসের সঙ্গে স্টিম (বাষ্প) বিক্রিয়া করিয়ে আগে হাইড্রোজেন তৈরি করে নেয়া হবে ফুয়েল সেলে যাবার জন্য। এর ফলে অবশ্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড বর্জ্য হিসেবে তৈরি হবে, যা পরিবেশ সহায়ক নয়। তবে বাড়িতে সরবরাহ করা প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের সুযোগ থাকায় এই মডেলটি অধিক সস্তা ও সহজ ব্যবহারযোগ্য হবে।

আর একটি ভিন্ন প্রকৃতির ফুয়েল সেল বাজারে আসছে যার নাম সলিড-অক্সাইড ফুয়েল সেল (এস.ও.এফ.সি)। এতেও হাইড্রোজেন আর বাতাসের অক্সিজেন ব্যবহার করা হয়। তবে এতে খুব উচ্চ উত্তাপ প্রয়োগ করে (১০০০° সেলসিয়াস পর্যন্ত) অক্সিজেনকেই আয়নিত করা হয় ইলেকট্রন পাওয়ার জন্য। উচ্চ উত্তাপের ব্যাপারটিই একটু ঝামেলা, কিন্তু এর দক্ষতা বর্তমানে পি.ই.এম. সেলের তুলনায় অনেক বেশি, অপেক্ষাকৃত কম হাইড্রোজেনেই এতে বেশি বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। বৃহৎ পাওয়ার কোম্পানি সিম্যান্স-ওয়েস্টিং ২০০৪ সালের মধ্যে ব্যাপক আকারে একে বাজারে আনার প্রত্যাশী। দামটিও তখন কিলোওয়াট প্রতি এক হাজার মার্কিন ডলারে নেমে যাবে যা কিনা বর্তমানের কয়লা থেকে সাধারণভাবে উৎপাদিত বিদ্যুতের সমতুল্য।

আরো বেশি আশার বাণী শোনাচ্ছে ব্রিটেনের জি-টেক কোম্পানি যা তৃতীয় আর একটি ফুয়েল-সেল প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে আলকেলাইন ফুয়েল সেল। এতে পি.ই.এম. ও এস.এ.এফ.সি. উভয়ের অসুবিধাগুলো দূর হবে বলে মনে হয়। এতে উচ্চ উত্তাপ লাগবে না। আবার ব্যয়বহুল প্লাটিনাম অনুঘটকও লাগবে না। সস্তা মেটাল-অক্সাইড অনুঘটক দিয়েই কাজ চলবে। এর ফলে কিলোওয়াট প্রতি মূল্য ৫০০ ডলার নেমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সব রকম ফুয়েল সেলেরই একটি বড় সমস্যা হল এখন পর্যন্ত সুলভে সবার কাছে হাইড্রোজেন জ্বালানী সরবরাহের কোনো সুরাহা হয় নি। যখন হবে তখন এটি খুবই সুবিধাজনক বলে প্রমাণিত হবে। আপাতত এর জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। যেমন বালার্ড পাওয়ার সিস্টেমের ফুয়েল সেলের জন্য হাইড্রোজেন আসবে মেটাল হাইড্রাইডরূপী কিছু বস্তুতে– যা অনেকখানি হাইড্রোজেন গ্যাস নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারে।

ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রযুক্তি হিসাবে ফুয়েল সেলের সঙ্গে যুক্ত হবে আরো অনেক প্রযুক্তি– সৌর বিদ্যুৎ, বায়ু-বিদ্যুৎ, ক্ষুদ্রাকার জলবিদ্যুৎ, মাইক্রোটার্বাইন ইত্যাদি। প্রথমে হয়তো একেবারেই এককভাবে ব্যক্তিগত বা স্থানীয় চাহিদা মেটাতে এরা নানা জায়গায় কাছ করবে– যেখানে যেটি সুবিধা। তারপর একসময় হয়তো এদের দশ-বিশটা বা আরো অনেকগুলো একত্রে জোট বাঁধবে একটি-

একটি 'ক্ষুদ্র-গ্রিড' গড়ে তুলতে। এর মধ্যে চলে আসবে ইনফরমেশন টেকনোলজির ছোঁয়া। ঐ আইটি-র মাধ্যমে গ্রিডের মধ্যে প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিজের দেখাশুনা করবে, গ্রিডের অন্যগুলোর সঙ্গে নিত্য যোগাযোগও রাখবে। একটার কোনো অসুবিধা বা ঘাটতি দেখা দিলে অন্যটার উদ্বৃত্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে টেনে নেবে–ফলে ক্ষুদ্র হয়েও সমগ্রের সুবিধা পাবে এদের প্রত্যেকে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত করা এদের সামগ্রিক উৎপাদন ক্ষমতা ও চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি দক্ষ ও লাভজনক হয়ে উঠতে পারবে।

উপগ্রহ ছাড়াই দূরে ইমেজ প্রেরণ

টেলিভিশনের ছবিকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যাওয়া এখন কোনো ব্যাপারই নয়। এটি সম্ভব হয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে এর ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রেডিও তরঙ্গকে প্রতিফলিত করতে পারার ফলে। তা নইলে পৃথিবীর বক্রতার কারণে সরল রেখায় গামী এই তরঙ্গ বেশি দূরে কোনো স্থানে পৌছানো সম্ভব হত না। রেডিওর ক্ষেত্রে অবশ্য অনেক দূরে বার্তা পাঠানোর বিষয়টি চলে আসছে প্রায় একশ' বছর আগে থেকে শর্টওয়েভ রেডিওসম্প্রচারের কল্যাণে। একশ' বছর আগে মার্কনি তাঁর বার্তাসংকেতকে আটলান্টিক মহাসাগর পার করিয়ে দুনিয়াকে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। উপগ্রহ-যুগের বহু আগে থেকে এটি কীভাবে সম্ভব হয়েছিল? এর উত্তর হল পৃথিবীপৃষ্ঠে বেশ কিছু উপরে বায়ুর যে আয়োনমণ্ডল আয়োনোস্কয়ার একে বেষ্টন করে রয়েছে সেখান থেকে শর্টওয়েভ রেডিওতরঙ্গ প্রতিফলিত হতে পারে। এভাবেই মার্কনি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সব শর্ট ওয়েভ রেডিও-সম্প্রচার পৃথিবীর বক্রতাকে ফাঁক দিতে সক্ষম হয়েছে। অতিসম্প্রতি ডিজিটাল ছবি দূরে প্রেরণের ক্ষেত্রেও এই আয়নমণ্ডলের সহায়তা নেয়া সম্ভব হয়েছে।

উপগ্রহের ভালো সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ইমেজ প্রেরণের জন্য এই প্রয়োজনটি আদৌ সৃষ্টি হল কেন। এর প্রাথমিক উদ্যোগ নিয়েছে ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা গবেষণাকেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা প্রধানত অনুসন্ধানী বিমান থেকে দূরপাল্লার ছবি আদান-প্রদানের জন্য। উপগ্রহ ভিত্তিক ব্যবস্থার জটিলতায় না গিয়েই তাঁরা এটি করতে চেয়েছেন। তা ছাড়া প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে বিভিন্নরকম বিকল্প ব্যবস্থা খোলা রাখাটাও তাঁরা প্রয়োজন মনে করেছেন। এর একটি সুফল পাওয়া যেতে পারে উন্নয়নশীল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জরুরি ইমেজ পাঠানোর ক্ষেত্রে যেমন টেলিমেডিসিনে। প্রত্যন্ত গ্রামের রুগী এ ক্ষেত্রে তার বুকের এক্সরে'র মতো ইমেজ বহু দূরের ডাক্তারকে

পাঠাতে চাইবেন অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থায়, অল্প খরচে। সে ক্ষেত্রে উপগ্রহ ব্যবস্থায় না গিয়ে সরাসরি শর্টওয়েভ রেডিওর কায়দায় পাঠাতে পারলে মন্দ হত না।

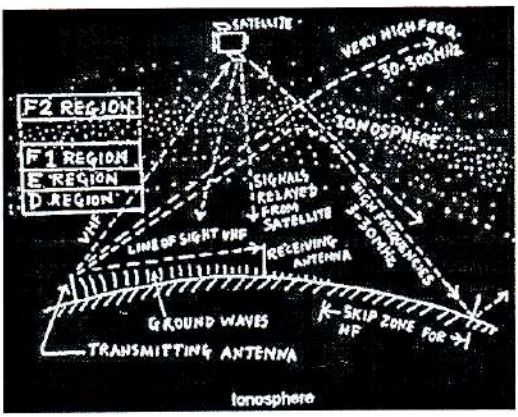

আয়োনমণ্ডলে গিয়ে শর্টওয়েভ তরঙ্গ সৌর-বিকিরণ সৃষ্ট আয়নিত গ্যাস-পরমাণুর স্তরের সাক্ষাত পায়। এটিই তরঙ্গকে প্রতিসরণের মাধ্যমে আবার ভূ-পৃষ্ঠের দিকে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু বিপত্তি হল এ প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু নয়েজ তরঙ্গবাহিত সিগন্যালে ঢুকে পড়ে। আয়োনমণ্ডলের নিজস্ব নড়াচড়া, গ্যালাক্সি থেকে আসা রেডিওতরঙ্গ, সৌরকলঙ্কের বাড়াকমা ইত্যাদিই এই নয়েজের কারণ। এরকম অবস্থায় শব্দের সিগন্যাল পাঠানো চলে বটে কিন্তু ফটোইমেজের মতো কোনো কিছুর সিগন্যাল তরঙ্গ আয়োনমণ্ডল থেকে প্রতিফলিত হয়ে গন্তব্যে যাওয়ার পর নয়েজের এত আধিক্য ঘটে যে, মূল ইমেজ খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য হয়।

এ জন্য ল্যাঙ্কাশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা গবেষণাসংস্থার বিজ্ঞানীরা নয়েজের মধ্য থেকে ইমেজ উদ্ধারের এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করেছেন। এতে পুরো ছবিটা চার ভিন্ন শেইডের ধূসর অংশে বিভক্ত করে ফেলা হয়। এরপর ঐ চারটি অংশের প্রত্যেকটিকে আবার ছোট ছোট বর্গক্ষেত্র ও রেখার সমাহারে ভাগ করে ফেলা হয়। এই জ্যামিতিক উপাদানগুলোকেই আসলে ডিজিট্যাল সিগন্যালরূপে পাঠানো হয়। নয়েজের ফলে এর একটি খণ্ডে দু'একটি বর্গ বা রেখার উপাদান হয়তো বাদ পড়ে যাবে। কিন্তু বাকি খণ্ডগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে ঐ ত্রুটিগুলো সংশোধনের ব্যবস্থা করা যায়। প্রত্যেকটি উপাদানকে সংকুচিত সিগন্যালের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করিয়ে সিগন্যাল প্রেরণকে দ্রুততরও করা যায়।

বিশ্বজুড়ে ইমেজ প্রেরণের ক্ষেত্রে উপগ্রহের সাহায্য নেয়া বাদ দিয়ে ব্যাপারটিকে আরো সহজ-সরল উদ্যোগে পরিণত করতে পারছে।

ক্ষুদ্র পাখা : মাইক্রোফ্যান

ছাদের সিলিংফ্যান, টেবিলে টেবিল-ফ্যান, হাতে-ধরা ব্যাটারিচালিত ব্যক্তিগত ফ্যান, যন্ত্রপাতি ঠাণ্ডা রাখার জন্য ছোট-ছোট ফ্যান– আর কত ছোট হতে পারে বাতাস করার পাখা। এবার উদ্ভাবক-বিজ্ঞানীরা নিয়ে এসেছেন একেবারেই ক্ষুদ্র পাখা– মাইক্রোফ্যান। কত ক্ষুদ্র এই পাখা? চট করে বোঝা যাবে যদি বলি ঘূর্ণায়মান একটি গোটা পাখা বসিয়ে দেয়া যাবে আলপিনের মাথার উপর। এতই ক্ষুদ্র এটি– যদিও এর রয়েছে যথারীতি আটটি ডানা (পাখার ব্লেড) যার প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য আধ মিলিমিটারেরও কম।

কার শখ হল এমনই ক্ষুদ্র পাখার বাতাস খাওয়ার? না ঠিক মানুষের বাতাস খাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে না এটি। বরং কম্পিউটারের মাইক্রোচিপের মতো ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক যন্ত্রকে যেন একেবারে তার মূল জায়গাতেই এরকম বাতাস করে ঠাণ্ডা করে রাখা যায় সে-চেষ্টাতেই উদ্ভাবিত হয়েছে এ পাখা। এখন যেভাবে কম্পিউটার বা অনরূপ যন্ত্রে বেশ বড় পাখা ঘুরিয়ে তার গোঙানির শব্দ শুনতে হয়, সেটি ঠাণ্ডা করার জন্য দক্ষও নয়, ব্যবহারের জন্য সুবিধাজনকও নয়। তাই আসছে মাইক্রোফ্যান।

পাখা জিনিসটা যদিও ত্রিমাত্রিক ব্যাপার, মাইক্রোফ্যানকে কিন্তু পরিকল্পনা করতে হয় দ্বিমাত্রিক রূপে– চেপ্টা তলে একটি নকশা যেভাবে আঁকা হয় সেভাবে। এর প্রত্যেকটি ডানা যুক্ত থাকে কেন্দ্রীয় একটি সংযোগদণ্ডের সঙ্গে একটি কব্জার মতো জিনিসের মাধ্যমে। যদিও শুরুতে সব কিছু চেপ্টা সমতলে থাকে, ঐ কব্জার দুপাশে দুটি স্বর্ণ-প্যাড থাকে। ওখানে ক্ষুদ্র এক ফোটা ঝালাই ধাতু (সোল্ডার)

ফেলে ডানাটিকে ঐ সমতল থেকে একটু উঁচু করে নেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে তরল ঝালাই-ধাতু আর স্বর্ণ-প্যাডের মধ্যকার পৃষ্ঠটানটিই (সারফেস টেনশন) কাজ করে। এভাবে সমতলে থাকা ডানা এবার সত্যিকার ফ্যানের ডানার রূপ লাভ করে।

ডানাগুলোর গোড়ায় সংযুক্ত কতগুলো পাত এবং সন্নিহিত সিলিকন ভূমির মধ্যে বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ প্রয়োগ করে যে স্থির বৈদ্যুতিক বলের সৃষ্টি হয় তার ফলেই পাখা ঘোরে। ২ কিলোহার্জ পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রয়োগ করে পাখাকে মিনিটে ৫০ থেকে ১৮০ বার বেগে ঘোরানো সম্ভব।

এই ক্ষুদ্র পাখার বহুরকম ব্যবহার সম্ভব হবে। কমপিউটারের ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশকে যথাস্থানে বসেই বাতাস করে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা তো করা যাবেই, তা ছাড়াও এটি মাইক্রোচিপ-নির্ভর ক্ষুদ্রাকার রাসায়নিক ল্যাবোরেটরিতে রাসায়নিক দ্রব্যগুলোকে পাম্প করে পরিচালনার কাজে ব্যবহার করা যাবে। এমনকি ভবিষ্যতে ক্ষুদ্রাকার যন্ত্রপাতিতে চলমান ক্ষুদ্রাকার যানবাহনে চলাচলের শক্তিও এই পাখার ঘূর্ণনের মাধ্যমে আসতে পারে।

তবে আণুবীক্ষণিক পোকা সদৃশ ক্ষুদ্রাকার যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনে গবেষণা করছেন এমন কিছু বিজ্ঞানী এই মাইক্রোফ্যানের অভিনবত্বে মুগ্ধ হলেও এর ধীর গতিতে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। তাঁদের লক্ষ্য মিনিটে এক মিলিয়ন বারের মতো অতিদ্রুত গতিসম্পন্ন ক্ষুদ্র চাকা বা টারবাইন। সেক্ষেত্রে এই মাইক্রোফ্যানের অংশসমূহের মধ্যে ঘর্ষণজনিত বাধাটি একটি বড় অন্তরায় হবে। যা দরকার তা হল ঘর্ষণবিহীনভাবে সংস্থাপিত পাখা বা চাকার ঘূর্ণন।

বিজ্ঞান চর্চায় অধিক মানুষের অংশগ্রহণ একুশ শতকের একটি সম্ভাবনা

একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান-সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য হবে এতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বাড়বে। আমরা যাকে এখন বলছি তথ্য প্রযুক্তি– সেটিই সুযোগ করে দিচ্ছে এমনি অংশগ্রহণের। তাছাড়া বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির ক্ষেত্রে চাহিদাও থাকবে এমনি ধরনের ব্যাপকতর অংশ গ্রহণের। এই চাহিদার পেছনেও বড় কারণ হলো অনেক কিছু হবে কম্পিউটারকে কেন্দ্র করে এবং পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্রকে কেন্দ্র করে।

কিছুটা ভিন্ন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ কিন্তু একসময় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছিল। অষ্টাদশ আর উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির অনেক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও অগ্রগতি এমন অনেকের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে যাদেরকে ঐ বিষয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিশেষজ্ঞ বলা যায়না। দুটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরকম দুটি উদাহরণ নেয়া যাক।

গ্রেগর মেন্ডেল ছিলেন অষ্ট্রিয়ার একটি মঠের পাদরী। মাঠের বাগানে যে মটরশুঁটির চারা ছিল সেগুলোর বিভিন্ন জাতের মধ্যে পরাগ সংযোগ ঘটিয়ে মেন্ডেল লক্ষ্য করলেন বংশগতির বৈশিষ্ট্যগুলো কি করে বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। তিনি এই বংশগতির মধ্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্য এক ধরনের এককের উপস্থিতি লক্ষ্য করলেন-যাকে আমরা পরবর্তীতে 'জিন' নাম দিয়েছি। এসব একক সন্তান কেমন করে বাবা ও মা উভয় থেকে এক সেট করে লাভ করে তারপর এর যে কোন একটি অথবা উভয়েই কেমন করে সন্তানের মধ্যে প্রকাশিত হয় বা হয়না এসব

তিনি খুব খুঁটিয়ে দেখেছিলেন মটরশুঁটির ক্ষেত্রে। এভাবেই আঠারশ' ষাটের দশকে আধুনিক জেনেটিক্সের ভিত রচনা করে গিয়েছিলেন গ্রেগর মেন্ডেল, যাকে একাডেমিক অর্থে বিশেষজ্ঞ না বলে বিষয়টিতে অত্যন্ত আগ্রহী সাধারণ মানুষ বলে বর্ণনা করাই অধিক সমীচীন।

১৮১৩ সালে লন্ডনের একজন বই-বাঁধাই কাজের শিক্ষানবীশ মাইকেল ফ্যারাডে বিজ্ঞানী স্যার হামফ্রি ডেভীর সহকারী হিসাবে একটি কাজ নিয়েছিলেন। তারপর প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি নিজেই নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন সর্বকালের একজন সেরা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানী হিসাবে, শুধু নিজের আগ্রহের ও উৎসাহের বলে। তাঁর আবিষ্কৃত বিদ্যুৎ-চৌম্বক আবেশ, জেনারেটর ও মোটরের কাজ সম্পর্কে ফ্যারাডে-নীতি, রসায়নের তড়িৎ-বিশ্লেষণ সম্পর্কে তাঁর আবিষ্কৃত নিয়ম না এলে আধুনিক বিদ্যুৎ-প্রযুক্তি ও মানুষের জীবনে তার যুগান্তকারী প্রভাবের শুরুটিই হতে পারতো না। নিজে যেভাবে বিজ্ঞানের জগতে ঢুকেছিলেন সাধারণ আগ্রহের কারণে, সেই আগ্রহ যেন আরো অনেকের মধ্যে নিয়ে আসা যায় সে জন্য তিনি প্রতি বছর খৃষ্টমাসের সময় ছোটদের জন্য বৈজ্ঞানিক বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করে তাতে নানা রকম পরীক্ষা প্রদর্শন সহ মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা দিতেন।

কালের পরিবর্তনে বিজ্ঞান ক্রমেই বেশী বেশী করে বিশেষজ্ঞের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এক একটি বিষয়ে দীর্ঘদিনের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও চর্চা ছাড়া এতে সত্যিকারের অবদান রাখা বেশ দুরূহ হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞের এই গুরুত্ব বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অনিবার্য-আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু এর পাশাপাশিই ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে আগামীতে আরো ব্যাপক অংশ গ্রহণের ফ্যারাডে বা মেন্ডেলের মত স্ব-উদ্যোগীদের সংখ্যা কখনই খুব বেশী ছিল না। সেকালের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাধারণ চাহিদা ও পরিস্থিতি থেকে নিজ উৎসাহ ও উদ্যোগকে সফল বিজ্ঞান চর্চায় রূপ দেবার সুযোগ অবশ্য তাঁরা পেয়েছিলেন- যার কারণে তাঁরা এতে এত বড় জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন। আগামীতে অংশগ্রহণের যে হাতছানি আসছে তার সুযোগও করে দেবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।

নূতন ধরনের চাহিদা, কিন্তু প্রকৃতিতে তা হবে আগেরগুলোর চেয়ে ভিন্ন। এর একটি বড় বৈশিষ্ট হবে এখানে অবদান রাখার মানুষ হবে অনেক বেশী। সবার অবদান খুব যুগান্তকারী নাও হতে পারে কিন্তু গুরুত্বের দিক থেকে ভূমিকা থাকবে অনেক মানুষের, যাদের সবাই বিজ্ঞানোন্নত দেশের বাসিন্দা হবেনা।

এখনই এটি আমরা কিছুটা লক্ষ্য করতে পারছি কম্পিউটারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা কর্মকান্ডের মধ্যে। কম্পিউটারের সঙ্গে কম্পিউটার উৎসাহী মানুষের যে

মিথস্ক্রিয়া তার মাধ্যমে অতিদ্রুত বিকশিত হচ্ছে-এক দিকে কম্পিউটার প্রযুক্তি, অন্য দিকে কম্পিউটারের মাধ্যমে অন্যান্য বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ। বিজ্ঞানের অনেক শাখাতেই আজ চর্চার বেশ খানিকটা জুড়ে আছে কম্পিউটার প্রোগ্রাম লেখা, কম্পিউটার সিম্যুলেশন করা ইত্যাদি অবশ্যই অত্যন্ত বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের সাধনার উপর বিজ্ঞান ভবিষ্যতেও নির্ভর করবে। কম্পিউটার ভিত্তিক বিজ্ঞানও তার কোন ব্যতিক্রম হবেনা। কিন্তু একই সঙ্গে কম্পিউটার সুযোগ করে দেবে অনেক ব্যাপকতর অংশগ্রহণের। কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা সফ্‌টওয়্যার তৈরীতে দক্ষতা লাগে, ধৈর্য লাগে এবং উৎসাহ লাগে। এরকম গুণ সম্পন্ন অধিক সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া এর উপায় নেই। তাছাড়া এর মধ্যে প্রয়োজন প্রতিভার ও তার প্রকাশের বৈচিত্রও- যেটি বিশ্বব্যাপী ব্যাপকতম অংশগ্রহণের মাধ্যমেই আসবে।

এই বিশ্বজোড়া অংশগ্রহণকেও সম্ভব করে দিয়েছে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি– বিশেষ করে দ্রুত অগ্রসরমান ইন্টারনেট। কম্পিউটার সফ্‌টওয়্যার তৈরী করতে কোন বিশেষ দেশের বিশেষ ল্যাবোরেটরীতে অবস্থানের প্রয়োজন হয়না। এর জন্য যে ধরনের যোগাযোগ, তথ্য বা সহযোগিতা দরকার তার সবই সম্ভব ইন্টারনেটের মাধ্যমে। শুধু সরাসরি কম্পিউটার নির্ভর গবেষণার ক্ষেত্রেই নয়, তথ্য প্রযুক্তি এখন সম্ভব করেছে ভার্চুয়াল ল্যাবোরেটরীর পরিবেশে কাজ করতে। দুনিয়ার কোন এক স্থানে স্থাপিত মূল্যবান যন্ত্রপাতিকে এখন হাজার হাজার মাইল দূরের অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারেন–তার গবেষণা চালিয়ে যেতে। এ সম্পর্কে আলোচনা, পরামর্শ, সভা সমিতি যে দূরে থেকেই করতে পারেন তা তো বলাই বাহুল্য।

এখনো যে বিশ্বের নানা দেশ থেকে, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশগুলো থেকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শত ফুল যে ফুটতে পারছেনা তার একটি বড় কারণ এখানকার সুপ্ত প্রতিভাগুলোর বিচ্ছিন্নতা, যোগাযোগহীনতা। কি নিয়ে ভাবতে হবে– সেই সমস্যাটাই তাদের কাছে তুলে ধরার উপায় নেই, বাকী কাজ তো দূরের কথা। ইন্টারনেটের বিচিত্র বিকাশের মাধ্যমে ভবিষ্যতে এই সমস্যা আর থাকবেনা। ইন্টারনেট বিজ্ঞান সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব নূতন মাত্রা যোগ করেছে। যে মানুষ দুনিয়ার যেখানে থেকে কাজ করুক তার অবদান সে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য মুহূর্তের মধ্যে তুলে ধরতে পারে। আবার যে এ সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্যগুলো খুঁজছে সেও মুহূর্তে সেগুলো সংগ্রহ করতে পারছে। সমস্যার উদ্ঘাটন, এ নিয়ে ভাবনা, কাজ এবং অবদান রাখা– এসবের বিশেষ সুবিধা সম্পন্ন কেন্দ্রগুলোতে একেবারে সীমাবদ্ধ থাকার সম্ভাবনা এখন কম। প্রচুর ক্ষেত্র থাকবে, যেখানে বহু উৎসাহী মানুষের কাজের সুযোগ থাকবে। সেখানে থেকে

অধিক সংখ্যায় ফ্যারাডেরা বা মেন্ডেলরা বেরিয়ে আসার সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে অনেক খানি। সবাইকে ফ্যারাডে বা মেন্ডেল হয়ে উঠতেই হবে এমন কথা নেই। আগামীতে বিজ্ঞানের অনেক কিছুই হবে ব্যক্তিগত যুগান্তকারী আবিষ্কারের চেয়েও অনেকের সম্মিলিত অবদানের ফসল। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গ্রামে বসেও যে মানুষ কাজ করে যাবে, তার কাজের স্বীকৃতিও বিশ্ব-বিজ্ঞানে যথেষ্ট থাকবে।

বিজ্ঞান সাহিত্যের একটি রূপ ইন্টারনেট হলেও তার সঙ্গে এ সাহিত্যের অন্যান্য রূপগুলোও সমন্বিত হতে হবে। স্থানীয় সচেতনতা ও অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টিকারী উদ্যোগগুলোর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবেনা। বরং ঐ শতফুল ফুটাতে দেয়ার যুগে এই উদ্যোগগুলোও একটি নূতন মাত্রা লাভ করবে। তখন 'পপুলার সায়েন্স' বলে কিছু বই বা কিছু পত্রিকাকে অপেক্ষাকৃত খাটো করে দেখবার কোন উপায় থাকবেনা, কারণ ব্যাপকতর বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ডের অনেকখানি প্রেরণা আসবে এদিক থেকেই। বিশ্বজোড়া অন্যান্য অসংখ্য মানুষ যা সৃষ্টি করবে তার প্রথম পরিবেশনা ঘটবে এই জনপ্রিয় বিজ্ঞান সাহিত্যেই। সেখান থেকেই অসংখ্য মানুষ উৎসাহ পাবে আরো জানার চেষ্টা করতে, ইন্টারনেটে তার অনুসন্ধান করতে, নিজেও তার সঙ্গে জড়িত হত।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে ইন্টারনেটের গুরুত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্ট্রানেটেরও গুরুত্ব বাড়বে। ইনট্রানেট সীমিত পরিসরে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি। আশা করা যায় বিশ্বজোড়া বিজ্ঞান কর্মস্থানীয় বিজ্ঞান কর্মকেও ব্যাপ্ত ও সুসংহত করতে সাহায্য করবে। এখানেও সৃষ্টি হবে চমকপ্রদ ও কার্যকর বিজ্ঞান সাহিত্যের– যার থাকবে একটি বড় সারা জাগানিয়া ভূমিকা। বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরা এখন ইচ্ছা করলেই নিজেদের দেয়াল ঘেরা অবস্থানে থাকতে পারবেন না– কারণ ব্যাপকতর বিজ্ঞানোৎসাহীদের সঙ্গে সংযোগ তাঁদের জন্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। তাঁদেরকে কতকটা ফিরে যেতে হবে মাইকেল ফ্যারাডের ভূমিকায়– যিনি খৃষ্টমাস বক্তৃতার মাধ্যমে ছোটদের চিন্তাকে নানাদিকে ধাবিত করার চেষ্টা করতেন।

বিজ্ঞান যে বড় বড় কেন্দ্র অভিমুখী না হয়ে ক্রমাগত অনেকের দিকে যেতে থাকবে তার আর একটি বড় কারণ হবে ভবিষ্যতে জীব-বৈচিত্রের দিকে বিজ্ঞানের আরো ঝুঁকে পড়া। জীব বৈচিত্র, ভূ-বৈচিত্র, আবহাওয়া-বৈচিত্র–এসব নিয়ে কাজ করাটা অনেকটাই নির্ভর করবে স্থানীয় বহু মানুষের এ কাজে এগিয়ে আসার মাধ্যমে। বাংলাদেশে জীব বৈচিত্রের অভ্যন্তরে যদি ঢুকতে হয় তা হলে একমাত্র সম্ভব বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে, ভূমি-ব্যবহারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে ঘনিষ্ঠভাবে এখান থেকে কাজ করে। আগামীতে বিজ্ঞানীরা এবং বিশ্ববাসী বিশ্বজোড়া আমাদের সীমাবদ্ধ জৈব ও প্রাকৃতিক সম্পদের সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থাকবেন– এবং

তাঁদের অনেকখানি প্রচেষ্টাকে এ সম্পদের সংরক্ষণ ও সর্বোত্তম ব্যবহারের দিকে নিবিষ্ট করবেন। স্পষ্টত: এটি গুটি কয়েক বাছা বাছা বিজ্ঞান কেন্দ্র বা কয়েকটি মহা-সম্পদশালী দেশের কাজ নয়। এই কাজ অনেকের, এবং অনেককে মিলেই এটি করতে হবে।

এই সব নানা ক্ষেত্রে অনেককে আকৃষ্ট করতে হলে– শুধু সুপরিকল্পিতভাবে পেশা হিসাবে গড়ে তোলা বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের উপর নির্ভর করলে চলবেনা। মনে হয় আগামী দিনের ঝোঁকটি হবে এমন যে তাতে মূল বিষয় বা মূল পেশার বাইরে গিয়েও অনেকে আগ্রহ দেখাবে, অবদান রাখবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে। শত ফুল ফুটতে গেলে এর প্রয়োজন রয়েছে। আগামীতে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি চাহিদা এমনি অনেকের আগ্রহের সুযোগও করে দেবে। কাজেই যিনি প্রকৌশলী, কিংবা পদার্থবিদ বা অর্থনীতিবিদ হচ্ছেন, তিনি এর বাইরে কিছু করতে পারবেন না, এ ধারণা ত্যাগ করার সময় এসেছে। খ্যাতনামা ও প্রবীণ অর্থনীতিবিদ কেনেথ গলব্রেথ একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে তিনি একটি সম্পূর্ণ ও সন্তোষজনক জীবন কাটাতে পেরেছেন কারণ তিনি অর্থনীতির বাইরেও কাজ করতে আগ্রহী হয়েছেন, আনন্দ পেয়েছেন এবং সফলও হয়েছেন। তাঁর মতে মানুষের একটি মাত্র জীবনে সে যত বেশি বিষয়ের স্বাদ পায় তত ভাল।

গলব্রেথ যা বলেছেন, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অনেকে একেই স্বাভাবিক হিসাবে নেবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চাহিদা এবং সুযোগ তাদেরকে বিচিত্র বিষয়ে অবদান রাখার সুযোগ করে দেবে। এ জন্য আজকের তরুণ-তরুণীরা যাতে ব্যাপকতর বিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ট থাকতে পারে সেরকম আবহ ও সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এক দিকে যেমন আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিকে খুবই সাদর অভ্যর্থনা করে সবার কাছাকাছি নেবার জন্য যথাসাধ্য করতে হবে, তেমনি ইন্টারনেটের ভেতরে এবং বাইরের বিজ্ঞান সাহিত্যের মধ্যে আমাদেরকে অংশগ্রহণ করতে হবে, নিজেদের জন্যও এই সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। আর যা বলার অপেক্ষা রাখেনা তা হলো যেখানে যেভাবে সম্ভব বিজ্ঞান চর্চার সুযোগগুলো সৃষ্টি এবং ব্যাপ্ত করা, কারণ সেটি আরো মৌলিকভাবে অপরিহার্য।

যৌথ গবেষণার কোল্যাবোরেটরী

বিজ্ঞানী দিনের পর দিন নিজের ল্যাবরেটরীতে দিন কাটিয়েছেন রাত কাটিয়েছেন এবং অবশেষে বের করে ফেলেছেন চাঞ্চল্যকর ফলাফল- এই তো আমরা জানি। সহকর্মী কেউ থাকলে তাঁরাও যন্ত্রের চারিপাশে এক সঙ্গে কাজ করেছেন, এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু ল্যাবরেটরী থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে বসে ঐ একই যন্ত্র দিয়ে দূরের অন্য কোথাও তাঁর আরো সহকর্মীরা একই গবেষণা করে যাচ্ছেন, প্রায়শ সবাই একযোগে– এমন ঘটনাও এখন বিরল নয়। ল্যাবরেটরী এখন পরিণত হয়েছে বৈজ্ঞানিক কোলাবোরেশনের কোল্যাবোরেটরীতে। আর এটি সম্ভব করেছে ইন্টারনেট।

ইন্টারনেট নিয়ে আমরা এখন অনেক মাতামাতি করছি। কিন্তু একথা মনে রাখিনি যে পুরো ব্যাপারটি ষাটের দশকে শুরু হয়েছিল যৌথ বিজ্ঞান গবেষণার স্বার্থে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিষয়ক কিছু গবেষণায় রত ছিল চারটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের কাজের সুবিধার জন্য ঐ চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার ব্যবস্থাকে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়। সেটিই ছিল আজকের বিশ্বজোড়া নেটওয়ার্কের প্রথম ধাপ। ঐ সংযুক্ত কম্পিউটারে চার জায়গায় বিজ্ঞানীরা একযোগে হিসাব-নিকাশ করতেন, গবেষণার তথ্য বিনিময় করতেন।

ইতিমধ্যে ইন্টারনেটের শুধু পরিধিই বাড়েনি, এর গতি আর সক্ষমতাও বেড়েছে অনেক গুণে। ফলে এখন দূরে বসে শুধু তথ্য বিনিময় করছেন না বিজ্ঞানীরা, একযোগে একই সময়ে নানা দূরবর্তী স্থানে বসে একই যন্ত্রে সত্যি সত্যি এক্সপেরিমেন্টও চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। এ যেন এক ধরণের কম্পিউটার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রসারিত ল্যাবোরেটরী। সানফ্রানসিস্কোর লরেন্স বার্কলী ল্যাবোরেটরীর

কথা ধরা যাক। এখানে রয়েছে দুনিয়ার সব থেকে জোরালো এক্স রে যন্ত্র যার শক্তিশালী আনুসাঙ্গিক সব যন্ত্রপাতি দিয়ে অণু-পরমাণু জগতের অত্যন্ত জটিল সব ঘটনার উদ্ঘাটন চলছে। এই এক্সরে যন্ত্র-সমাহারের দায়িত্বে প্রধান বিজ্ঞানী ব্রায়ান টোনার কিন্তু যন্ত্রের কাছেই থাকেন না। তিনি অধিকাংশ সময় কাজ করেন ৩০০০ কিলোমিটার দূরে উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়। দৈনিক যে কম্পিউটার পর্দায় তিনি মাথা ঠেকিয়ে থাকেন– ওখান থেকেই সব করা যাচ্ছে। তাঁর প্রধান কাজ এক্সরে উৎসের সঙ্গে যে অনেকগুলো ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ সংযুক্ত আছে সেগুলো দিয়ে পরীক্ষণ চালানো। এটি তিনি তাঁর কম্পিউটার থেকে সরাসরি নির্দেশ দিয়েই করেন নির্দেশ দেন সহকর্মীদেরকে, নির্দেশ দেন যন্ত্রকেও। একইভাবে উভয়ের সঙ্গে নিত্য পরামর্শও করেন পরীক্ষণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঠিক করতে। ৩০০০ কিলোমিটার দূরে বসেও যন্ত্রের সব আচরণ, সব বক্তব্য, তাঁর কাছে ধরা পড়ে। লরেন্স ল্যাবোরেটরীতে সশরীরে থাকলে যা যা করতেন তার প্রায় সবই দূর থেকে করতে পারেন ব্রায়ান টোনার। সেই সঙ্গে প্রয়োজন মত অন্যান্য সহযোগী ল্যাবোরেটরীগুলো থেকেও উপাত্ত পাচ্ছেন তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা। প্রয়োজন মত সুদূর থেকে এক্সপেরিমেন্ট করে নিচ্ছেন অন্য ল্যাবের অন্য যন্ত্র দিয়েও।

আর একটি উদাহরণ নেয়া যাক। সৌর শিখার প্রবাহের সঙ্গে পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলের আবহাওয়ার সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করছে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। তাঁরা এই ব্যাপারে সহযোগিতা নিচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় আরো ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। কিন্তু আসল ল্যাবোরেটরীটা এই সাত জায়গার কোথাও নেই। সেটি রয়েছে গ্রীনল্যান্ডে, যেখানে একটি বিশেষ রাডার উচ্চ বায়ুমন্ডলকে নিত্য চোখে চোখে রেখেছে। এখান থেকে উপাত্ত চলে যাচ্ছে দূরবর্তী সাতটি ল্যাবোরেটরীতে। সেখানে চলছে বিশ্লেষণ, পরামর্শ, বৈজ্ঞানিক নির্দেশনা ইত্যাদির কাজ। এখানে কর্মরত একজন বিজ্ঞানীর মতে "এ যেন নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকা আমাদের সবাইকে নিজের ঘরেই গ্রীণল্যান্ডের উর্ধাকাশ পর্যবেক্ষণের একটি জানালা দিয়ে দিয়েছে– ওখানে গিয়ে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হচ্ছেনা।"

বিশ্বজোড়া যৌথ গবেষণার উপকার কিন্তু হাতে হাতেই ফলছে। এখন কয়েকজন মাত্র বিজ্ঞানীকে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, তাত্ত্বিক বিবেচনা- সব কিছু করতে হচ্ছেনা একের পর এক সময় নিয়ে। পর্যবেক্ষণ করছেন অনেকে, তাঁদের অনেকে যে যার মত বিশ্লেষণের কাজে লেগে যাচ্ছেন, পরস্পরের সঙ্গে এ নিয়ে নিত্য মতবিনিময় করছেন। বিশ্লেষণ সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে হচ্ছে বলে পর্যবেক্ষণকেও সেভাবে পরিবর্তন করে নেয়া যাচ্ছে।

কোল্যাবোরেটরীর সংখ্যা এখনো সীমিত। এর ব্যাপকতর প্রচলনের পথে কিছু কিছু বাধা এখনো রয়ে গেছে। ইন্টারনেটের উপযুক্ততা অনেক বাড়লেও একযোগে গবেষণার জন্য বিভিন্ন ল্যাবোরেটরীর মধ্যে যে বিপুল পরিমাণ তথ্য নিয়মিত আদান-প্রদান করতে হয়, ইন্টারনেটে এখনো ওরকমের ব্যান্ড-উইডথ নেই; অর্থাৎ তথ্য মহা-সড়কের বহন ক্ষমতা তার উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। অন্য দিকে এখন ইন্টারনেটের ব্যবহারকারী অসংখ্য শাখা-প্রশাখার জটিলতা অকল্পনীয়। এই দ্রুত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেটের নির্ভরযোগ্যতা কিছুটা কমে যাচ্ছে যেটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটায়। ইন্টারনেটে যখন আমরা কথোপকথন, চিঠিপত্র বা ফাইল বিনিময় করি তখন অন-লাইনে কিছুটা বিঘ্ন ঘটলে বা ভুল ঢুকলে সেটি মারাত্মক হয়না; শুধরে নেয়া যায়। কিন্তু যে বিজ্ঞানী ইন্টারনেটের মাধ্যমে সিগন্যাল পাঠিয়ে দূরবর্তী কোন যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাঁর ক্ষেত্রে এরকম বিঘ্ন মেনে নেয়া যায় না। এটি এক্সপেরিমেন্ট পন্ড করা থেকে শুরু করে যন্ত্রপাতি নষ্ট করা পর্যন্ত অনেক কিছু ঘটাতে পারে।

ইন্টারনেটের সীমাবদ্ধতাটা বিশেষভাবে দেখা যাচ্ছে ভিডিও ছবি আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে। যন্ত্রপাতির অবস্থা কি, সেগুলো নিয়ে স্থানীয় বিজ্ঞানীরা কিভাবে কাজ করছেন তা সব সহযোগীদের দেখা প্রয়োজন। তাঁদের সঙ্গে এবং যৌথ গবেষণার অন্যান্য জায়গায় অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে চাক্ষুষভাবে জড়িত থাকাটি গবেষণার স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ। এতে দূরবর্তী বিজ্ঞানী পরীক্ষণের সঙ্গে কায়-মনোবাক্য সমন্বিত হতে পারেন, সেই আবহের মধ্যে থাকতে পারেন। কিন্তু ইন্টারনেটের ব্যান্ড-উইডথ সীমাবদ্ধ বলে এটি অবাধে করা যাচ্ছেনা। ভিডিওর ব্যবহার নানাভাবে সীমাবদ্ধ থাকছে। যেমন অল্পের মধ্যে কোন রকমে কাজ সারার জন্য কি হারে পিকচার-ফ্রেম পাঠানো হয় তাকে মন্থর করে দেয়া হচ্ছে- যাতে ব্যান্ড-উইডথ এর সাশ্রয় হয়। কার্যত এক বা দুই সেকেন্ড মাত্র একটি ফ্রেম করে ছবি যায়। জিনিসটি বেশ কৃত্রিম মনে হতে পারে, কখনো বেশ বিরক্তিকরও। ধরা যাক, কেউ হাই তুলছেন এমন একটি বিব্রতকর মুহূর্তের ছবির ফ্রেমটাই সর্বত্র প্রেরিত হলো এবং পর্দায় দুই সেকেন্ড স্থায়ী হল– কি জ্বালা! অবশ্য কোন ডিভিও না থাকার চেয়ে এও ভাল বলেই মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। ল্যাবোরেটীর পুরো আবহ আনতে হলে ইন্টানেটের জন্য ভিডিও ছবি নেবার কায়দা কানুনও বদলাতে হবে। বিজ্ঞানীরা হেঁটে চলে কাজ করছেন কথা বলছেন এমনি অবস্থায় ছবি নিতে পারতে হবে। ধরা যাক আপনি কোন বিজ্ঞানীর সঙ্গে কথা বলছেন। কথা বলতে বলতে তিনি একটি টেবিলে গিয়ে কিছু যন্ত্রাংশ ঝালাই করে নিলেন। এমনটি হলে আপনিও তাঁর সঙ্গে হেঁটে ঐ টেবিলে যাওয়ার কথা। দূর থেকে সান্নিধ্যেও সেই সুযোগ থাকা চাই। তাহলেই দূরবর্তী ব্যবহারকারীর কাছে ল্যাবোরেটরীর আবহ জীবন্ত হয়ে উঠবে।

ইন্টারনেটে যুক্ত হয়ে কোল্যাবোরেটরী পর্যায়ে চলে গেলে কোন যন্ত্রপাতির অবস্থান বা কম্পিউটার সংযোগ কম্পিউটার-বখাটেদের হাতে থেকে নিরাপদ রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যন্ত্রের অবস্থান এখন আর গোপন রাখার উপায় নেই, কারণ কোল্যারোরেটীর অর্থই হলো এটি অনেকের জন্য। দূর থেকে যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দূর থেকে একইভাবে নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়ে বখাটে কেউ যন্ত্র নষ্টও করে দিতে পারে। এজন্য চেষ্টা চলছে উপযুক্ত নিরাপত্তাযুক্ত চাবির ব্যবস্থা করতে যা শুধু বৈধ ব্যবহারকারীর হাতেই থাকবে। ভিডিও কনফারেন্সের ক্ষেত্রে আড়িপাতার কাজ প্রায়ই হচ্ছে, কারণ এটি খুবই সহজ। অনেক বিজ্ঞানী এও মোটেই পছন্দ করবেননা। সহযোগী বিজ্ঞানীদের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াস তাঁদের থাকবে। এদিক থেকেও কোল্যাবোরেটরীর তথ্য-নিরাপত্তা কিছুটা নাজুক অবস্থায় থাকে। কোল্যাবোরেটরীর নানা সহযোগী ল্যারোটরীর একটি সমস্যা দাড়াঁতে পারে এর মূল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় কম্পিউটারে সফটওয়্যার প্রায়শই বদলাবার, বা উন্নত করার প্রয়োজন–এক্সপেরিমেন্টের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সহযোগীদের কম্পিউটারও যদি তার সঙ্গে তাল না রাখতে পারে তাহলে যৌথ কাজে বাধা আসতে পারে। এর থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য এখন সুযোগ নেয়া হচ্ছে অপেক্ষাকৃত নতুন ইন্টারনেট কম্পিউটার ল্যাংগুয়েজ "জাভার"। জাভার একটি গুণ হলো এর আওতায় ছোট ছোট প্রোগ্রামগুলোকে এমনভাবে নির্দেশ দেয়া যায় যাতে মূল কম্পিউটারের এদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য কম্পিউটারেও ঐ পরিবর্তন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে যায়, ব্যবহারকারীকে কিছু জানতেই হয়না।

কোল্যবোরেটরী যেভাবে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসছে, তাতে বর্তমান অসুবিধাগুলো বেশী দিন স্থায়ী হবেনা। এর সুবিধার জোয়ারে ওসব সমাধান হয়ে যাবে। সবচেয়ে বেশী সুবিধা হবে গবেষণা ছাত্রদের, সাধারণত আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে যারা নিজেরা দূরবর্তী বড় ল্যাবোরেটরীর সুযোগ নিতে পারেনা। হয়তো দু'একবার গিয়ে কিছু কাজ করে আসে। বাকী সময় শিক্ষক-তত্বাবধায়ক বিজ্ঞানী তাঁদের আসা যাওয়ায় যা তথ্য, পরীক্ষা-ফলাফল এনে দেন সেসব বিশ্লেণষণ করেই ছাত্রদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। কোল্যাবোরেটরী পরিবেশে তারা নিজেরাই সরাসরি পরীক্ষা চালাতে পারে– বড় ল্যাবোরেটরী বড় যন্ত্রের সুযোগ নিজেরাও নিয়মিত পেতে পারে।

একইভাবে ছোট ছোট কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যারা প্রত্যেক ভাল ল্যাবোরেটরীর অর্থ যোগান দিতে পারেনা, তারা এক জোট হয়ে নিজেদের জন্য যৌথ যন্ত্রপাতির আয়োজন করতে পারে– যা বিভিন্ন ল্যাবে থাকবে– কিন্ত

ইন্টারনেটে সবাই ব্যবহার করবে। দূরবর্তী বড় বিজ্ঞানী যিনি আসা যাওয়ার জন্য বেশী সময় দিতে পারেন না তাঁকেও গবেষণায় পরামর্শ দানের জন্য পাওয়া যাবে, শুধু ফলাফলগুলো তাঁকে দূর থেকে দেখিয়ে আলাপ করে।

দূরে ল্যাবোরেটরীতে সশরীরে গিয়ে কাজ করতে পারছিনা– শুধু এই কারণে মন্দের ভাল হিসাবে কোল্যাবোরেটরী, এই কথাও অনেকে মানতে চাইছেননা। তাঁরা মনে করেন গিয়ে কাজ করার চেয়ে বরং এটাই ভাল। কারণ এতে কাজের নমনীয়তা থাকে, সময়ের অপচয় কম হয়। যখন যেখানে যার সঙ্গে, যে বিষয়ের উপর ফোকাস করা দরকার শুধু তাই করলে চলে। কখনো সাক্ষাত আলাপে জানার চেয়ে টেলিফোনে সংক্ষিপ্ত আলাপে যেমন অনেক জিনিস দক্ষতর ভাবে জানা যায়– এও অনেকটা সে রকম। আগামী দিনের বিজ্ঞান চর্চা যে ক্রমেই বেশী বেশী করে কোল্যাবোরেটরীতে হবে সেটি প্রায় নিশ্চিত।

আণবিক আকারের কলকব্জা

বিজ্ঞানীরা এখন বড় একটি চ্যালেঞ্জ তাঁদের হাতে নিয়েছেন। এটি হলো অতি ক্ষুদ্র মেশিন তৈরি করার চ্যালেঞ্জ। সাধারণভাবে ক্ষুদ্র হবার ব্যাপার নয় এটি, একেবারে অণু-পরমাণুর মাপে নিয়ে গিয়ে ক্ষুদ্র! 'মাইক্রো' কথাটির সঙ্গে এখন আমরা খুব পরিচিত, কারণ আমাদের ব্যবহার্য অনেক জিনিসকে এখন আমরা মাইক্রো পর্যায়ের ছোট করে নিতে পেরেছি—যেমন মাইক্রোচিপ, মাইক্রোপ্রসেসর ইত্যাদি। এটি এক মিলিমিটারের হাজার ভাগের এক ভাগ পরিমাপ। তারও যদি হাজার ভাগের এক ভাগে যাই তবে সেটি হবে 'ন্যানো' পর্যায়ের। আমরা যে মেশিন বা যন্ত্রের কথা বলছি তা হলো সেই ন্যানো পর্যায়ের ক্ষুদ্র। প্রযুক্তিকে এই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখন বিজ্ঞানীরা খুবই সচেষ্ট। এই ন্যানো প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটি বড় স্বপ্ন হলো এই সাইজের যন্ত্রপাতি তৈরি করা। স্বপ্নই বা বলি কেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি রীতিমত তৈরিও হয়ে গেছে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি হয়েছে জৈব অণু দিয়ে গড়া এমনি একটি মেশিন— যার সাইজ রক্তের লোহিত কণিকারও পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এই মেশিনে ই-কলাই ব্যাকটেরিয়ার একটি প্রোটিন ব্যবহার করা হয়েছে। নিকেলের তৈরি একটি লাটাই সদৃশ জিনিসের সঙ্গে একটি প্রপেলার লাগিয়ে সেটি আবার ঐ প্রোটিনের সঙ্গে আটকানো রয়েছে। প্রপেলারটির কয়েক ন্যানোমিটারের বেশি বড় নয়—অর্থাৎ কিনা মিলিমিটারের হাজার ভাগেরও হাজার ভাগের সময় পর্যায়ের! জৈব কোষে যেভাবে শক্তি উৎপাদিত হয় এই মেশিনের প্রপেলারও সেই শক্তিতেই ঘুরে। শরীরের শিরা উপশিরার মধ্য দিয়ে রক্তের লোহিত কণিকা যে রকম স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করতে পারে আস্ত এই মেশিনও যে তা পারবে তা বলাই বাহুল্য।

সেভাবেই শরীরের কোষে কোষে নিয়ে গিয়ে একে কোন কাজে হয়তো লাগিয়ে দেয়া যাবে একদিন।

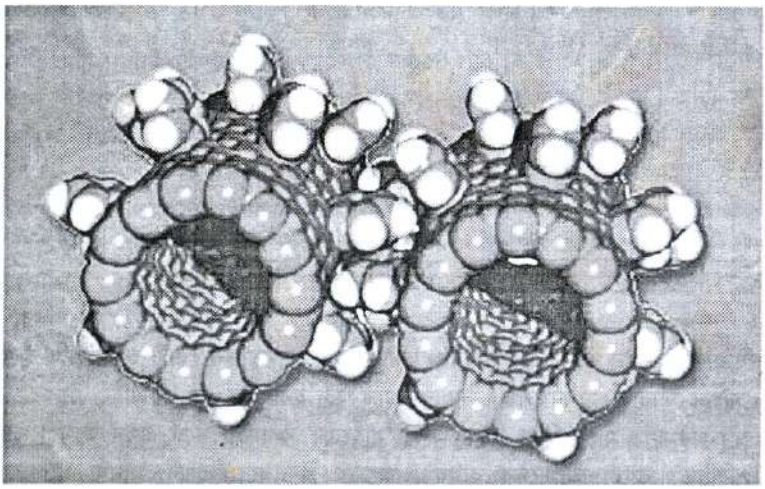

ক্ষুদ্র হবার বিপত্তি

এ ধরনের একটি সম্ভাবনার কথা পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যান প্রথম বলেছিলেন আজ থেকে বহু বছর আগে ১৯৫৯ সালে আমেরিকান পদার্থবিদ্যা সমিতির এক সম্মেলনে। ফাইনম্যান অবশ্য মজার ভাষায় পদার্থবিদ্যার অনেক বড় বড় তত্ত্বকেও উপস্থাপনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এমনি একটি ক্ষুদ্র মেশিন তৈরিতে পদার্থবিদ্যার দিক থেকে সমস্যাগুলো কি হতে পারে, সম্ভাব্য উপায়ও বা কি হতে পারে– এসব তিনি সেদিন খুব মজা করে বলছিলেন।

ফাইনম্যান দেখালেন ধরা যাক একটি মোটর গাড়ীকে যদি অনেক ক্ষুদ্র আকারে তৈরি করতে হয় তা হলে এর সব যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের ঐ পর্যায়ের নির্ভুলতা থাকতে হবে– যেমন পিস্টন আর সিলিন্ডারের মধ্যে ফিটিংসে। হয়তো প্রয়োজন হবে এক ইঞ্চির ১০ হাজার ভাগের চার ভাগের নির্ভুলতা। ওরকম একটি অবস্থায় ঐটুকু ভুল হলে তা হবে স্বল্প সংখ্যাক পরমাণুর আকারের সমান ভুল! তার মানে সে অবস্থায় আমাদেরকে অণু-পরমাণুর পর্যায়ে ভাবতে হবে। অতখানি নির্ভুল ভাবে গাড়িটি তৈরি করতে পারলে আমরা আসল গাড়ির চার হাজার ভাগের এক ভাগ সমান গাড়ি পাব- অর্থাৎ প্রায় এক মিলিমিটার সাইজের। এর চেয়েও নিঁখুত করতে পারলে আরো ছোট করে গাড়ি তৈরি সম্ভব। পদার্থবিদ্যার হিসাবে দেখা যায় একই

রকম টানা পোড়েনের জন্য ঐ রকম ক্ষুদ্র পর্যায়ে আয়তনের সঙ্গে সঙ্গে বলও কমে যায় সাংঘাতিক ভাবে। অর্থাৎ এখন বস্তুর ওজন, জড়তা ইত্যাদির তেমন কোন মানে থাকে না। এর ফলে তুলনামূলক ভাবে বস্তুর সবলতা বেড়ে যাবে। ঐ রকম ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের তাপ খুব তাড়াতাড়ি হারিয়ে যাবে, তাই অন্তর্দহন ইঞ্জিনের মত ইঞ্জিন এখানে কাজ করবেনা- যথেষ্ট তাপ জমিয়ে উঠতে পারবেনা বলে। তাই এ রকম যন্ত্রে শক্তি সঞ্চারের বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে (কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যানো-মেশিনটি তৈরিতে যেমন জীবকোষের শক্তি ব্যবহার করা হয়েছে)।

তৈরি হবে কেমন করে?

ফাইনম্যান তাঁর অতি ক্ষুদ্র মেশিনটি তৈরির একটি সম্ভাব্য পদ্ধতির কথাও বলেছিলেন। বড় বস্তু কাটা ছেড়াঁ করে নয়, বরং এক একটি পরমাণু যেমনটি দরকার জুড়ে জুড়ে একত্র করে এটি তৈরি হতে পারে। ১৯৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের এম আই টি তে কর্মরত এরিক ড্রেক্সলার 'ইঞ্জিন অব ক্রিয়েশন' নামে একটি বই লিখে বেশ হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন। এই বইতে তিনি দেখিয়েছেন যে যেভাবে অণু-পরমাণুকে প্রায় বড় জিনিসের মতই নড়াচড়ার ক্ষমতা আমাদের বাড়ছে, মানুষ শিগগির কোনদিন ঐ অণু-পরমাণুর সাইজের মেশিন তৈরি করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে মানুষ জৈব প্রকৃতিকেও হার মানিয়ে জীবকোষের চেয়েও ক্ষুদ্র কার্যকর যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করবে। শুধু তাই নয় জৈব প্রকৃতি যেটি অহরহ করছে– একটি কোষের মত হুবহু আর একটি কোষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি করছে– তারই প্রায় অনুরূপ পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র মেশিনের অসংখ্য প্রতিলিপিও সৃষ্টি সম্ভব হবে। আসলে জৈব প্রক্রিয়ার অনুসরণে মানুষের এসব ক্ষুদ্র মেশিন শারীরবৃত্তীয় কাজে সূক্ষ্মভাবে হস্তক্ষেপও করতে পারবে। এবং সেটি যদি নিয়মিতভাবে সক্ষম হয় তা হলে এসব মেশিন কোষের ভেতরে গিয়ে সেখানে মেরামত কাজ করে রোগ, বার্ধক্য থেকে মানুষকে মুক্তিও দিতে পারবে। এভাবে ইঞ্জিন অব ক্রিয়েশন বইটিতে খুবই উচ্চাকাঙ্খী একটি সম্ভাবনার চিত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তির মাধ্যমেই তুলে ধরা হয়েছে। এটি এক দিকে যেমন ন্যানো মেশিনের গবেষণাকে এক ধরনের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে তেমনি অনেকেই একে অবাস্তব প্রত্যাশা সৃষ্টির দায়ে অভিযুক্তও করেছেন। তাঁদের মতে এরকম প্রত্যাশা বাস্তবে সংঘটিত সাফল্যগুলোকে বরং অবমূল্যায়িতই করছে।

ক্ষুদ্র মেশিন কী কাজে লাগবে ?

ড্রেক্সলারের দৃশ্যপট অনুযায়ী গবেষণা বেশি না এগুলেও ন্যানো মেশিন ইতোমধ্যেই সম্ভব হয়েছে। ক্যানসার অথবা বার্ধক্যকে অতিক্রম করার কাজে না

লাগলেও অসুখের সময় ওষুধ আরো ভালভাবে গ্রহণের সুবিধা এসব মেশিন এখনই দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। রিচার্ড ফাইনম্যান যখন ন্যানো মেশিনের সম্ভাবনার কথা বলছিলেন তখন তিনি এর সম্ভাব্য ব্যবহারের প্রসঙ্গটিও তুলেছিলেন। মজা করে বলেছিলেন যে নিশ্চয়ই ক্ষুদ্র জীবাণু যাতে ড্রাইভ করে বেড়াতে পারে সে জন্যই তিনি ক্ষুদ্র মোটরগাড়ীর কথা বলছেন না। তিনি বরং শরীরে রোগ সারাবার জন্য ন্যানো মেশিনের ক্ষুদ্র রোবট সার্জনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলেছেন। একে রক্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে হার্টের কাছে পৌঁছে একযোগে অনেকগুলো মেশিন মিলে হয়তো ওখানে বসেই হার্টের নষ্ট ভাল্বটি মেরামত করে দেবে। শুধু তাই নয়, এরকম কোন কোন মেশিনকে শরীরের নানা অঙ্গকে সাহায্য করার জন্য স্থায়ী ভাবেই সেখানে বসিয়ে দেয়া যাবে। জীবকোষের চেয়ে ছোট হবে বলে কোষের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে তার তেমন কোন অসুবিধা হবে না। বর্তমানে যে ন্যানো মেশিন সম্ভব হয়েছে তার সৃষ্টিকাররা অনেকটা ফাইনম্যানের ঐ স্বপ্ন ধরেই এগুতে চাচ্ছেন মেশিনগুলোর ব্যবহারের ক্ষেত্রে।

ডায়াবেটিক রুগির দেহে

খুব বিস্তারিত মেশিন না হলেও এরকম প্রথম ন্যানো প্রযুক্তির প্রয়োগের পরীক্ষা নিরিক্ষা প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তেজাল দেশাই (ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহিলা বিজ্ঞানী) ডায়াবেটিক রুগির জন্য প্রয়োজনীয় ইনসুলিন সময়মত স্বয়ংক্রিয়ভাবে রক্তে পৌঁছাবার জন্য এ প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন। এ জন্য তিনি এক মিলিমিটারের এক দশমাংশ বড় একটি ছোট্ট সিলিকন বাক্স তৈরি করেছেন যা চারিদিকে অতি ক্ষুদ্র সব ছিদ্রের ব্যবস্থা করেছেন যেগুলোর ব্যাস ২০ ন্যানোমিটারের বেশি নয়। ইলেকট্রনিক্সে সচরাচর ব্যবহৃত ফটো-লিথোগ্রাফিক পদ্ধতিতে ছিদ্রগুলো করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে মানুষের একটি চুলই এক লক্ষ ন্যানোমিটার পুরু। ছিদ্রগুলো এতই ক্ষুদ্র যে কোন কোন অণু এর ভেতর দিয়ে যেতে পারে, কিন্তু একটু বড় অণুগুলো যেতে পারে না। এই বাক্সে রাখা আছে কুকুর অথবা শূকরের প্যানক্রিয়াসের ইনসুলিন সৃষ্টিকারী কোষ সহ কিছু কলাজেন কোষকলা। এই সব নিয়ে ঐ ক্ষুদ্র বাক্সটি সহজেই ডায়াবেটিক রুগীর শরীরে বসিয়ে দেয়া হয়। গ্লুকোজের অণু বেশ ছোট বলে রক্তের গ্লুকোজ সহজে ঐ ছিদ্র দিয়ে বাক্সে ঢুকে এবং ওখানকার কোষগুলোকে স্পর্শ করে। ঐ কোষ যদি বেশি গ্লুকোজ অনুভব করে, তা হলে তা ইনসুলিন তৈরি আরম্ভ করে। ইনসুলিনও তুলনামূলকভাবে ছোট অণু হওয়াতে এটি ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে এসে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারে। কাজেই দিনের বিশেষ সময়ে দু'একবার

ইনসুলিন ইনজেকশন নেবার বদলে এই ন্যানো প্রযুক্তি প্রায় একজন স্বাভাবিক মানুষের শরীরের মত নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে রক্তের গ্লুকোজকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাক্সের ছিদ্রগুলো ক্ষুদ্র হওয়ার কারণে বড় আকারের অণু এর মধ্য দিয়ে যাওয়া আসা করতে পারে না। ফলে শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কোন বিজাতীয় কোষকে ধ্বংস করার জন্য যে এন্টিবডি অথবা কমপ্লিমেন্টারী প্রোটিন ব্যবহার করে তার অণু ঐ ছিদ্র দিয়ে ঢুকতে পারেনা। কাজেই এই এন্টিবডি অণুগুলো ইনসুলিন সৃষ্টিকারী বিজাতীয় কোষের নাগাল পায়না– সেগুলো নিরাপদেই থাকে। এটি না হলে আদৌ ব্যবস্থাটিই সম্ভব হতো না, বাইরের ইনসুলিন সৃষ্টিকারী কোষ দেহে রাখাই যেতনা। ডায়াবেটিক্স রোগে আক্রান্ত ইঁদুরের দেহে এরকম ক্ষুদ্র বাক্স ঢুকিয়ে চমৎকার ফল পাওয়া গেছে। সপ্তার পর সপ্তা ধরে ইঁদুরের রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে থেকেছে- স্বয়ংক্রিয়ভাবে। এখন মানুষের উপর পরীক্ষা শেষ হলেই এটি বাজারে আসতে পারে আশা করা যায়।

একই ধাঁচের কাজের জন্য কিন্তু আরো চাঞ্চল্যকর ন্যানো মেশিন উদ্ভাবন করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস বেকার। তিনি ন্যানো আকারের কিছু গোলকাকৃতির অণু গড়ে তুলেছেন স্তরে স্তরে পরমাণু সাজিয়ে - অনেকটা যেভাবে ফাইনম্যান ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন অথবা ড্রেক্সলার বর্ণনা করেছেন। এ অণুগুলোর কাজ হবে শরীরে গিয়ে অসুস্থ কোষকে সনাক্ত করে সেটিকে রাঙিয়ে দেয়া। মারাত্মকভাবে আহত কোষ থেকে যে এনজাইম বের হয় তার ফলে ঐ অণু ফ্লোরোসেন্ট হয়ে আলো ছড়াতে থাকে। একই সঙ্গে এর থেকে ওষুধ নির্গত হয়ে ঠিক সেই কোষকেই বিনষ্ট করতে পারে। পরে আলট্রাভায়োলেট লেজার আলো ওখানে ফেললে বুঝা যাবে যে চিকিৎসাটি কতখানি সম্পন্ন হয়েছে। স্তরে স্তরে অণুগুলো যখন গড়া হয় তখনই এর মধ্যে বিজাতীয় অণু হিসাবে ধ্বংস না হবার ব্যবস্থা করে দেয়া যায়। কাজেই দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে এটি দ্রুত আহত কোষে গিয়ে ঢুকতে পারে।

জীবকোষের নজরদারিতে

জীবকোষের প্রকৃত অবস্থা প্রতি মুহূর্তে জানতে হলে যে মেশিন দরকার তার আকারও জীবকোষের সমান হলেই ভাল, আর এখন এমনটিই হতে যাচ্ছে। এরকম একটি ক্ষুদ্র মেশিন হার্টের কোষের সঙ্গে ওখানে বসে হার্টের কাজ কর্ম, উচ্চ রক্তচাপ, ও হার্ট এট্যাকের আসন্নতা সম্পর্কে আগাম খবর দিয়ে আমাদের জীবন রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। বর্তমানে কোষ পর্যায়ে এ ধরনের খবর পেতে হলে প্রত্যেকবার যথেষ্ট কঠিন প্রক্রিয়ায় সূঁচ, পিপেট ইত্যাদির প্রয়োগে হার্ট থেকে

কোষ বের করে আনতে হয়। তারপর সেই কোষকে কালচার করে বৈকল্যের খবরগুলো পাওয়া যেতে পারে। তবে সেখবর বেশি নিখুঁত নাও হতে পারে, কারণ কোষ বের করে আনার ফলে সে তার স্বাভাবিক অবস্থানে যে সব পুষ্টি দ্রবণে স্নাত থাকে, সেই পরিবেশের বাইরে চলে আসে। এতে তার আচরণেও তারতম্য ঘটে থাকে। কাজেই যথাস্থানে রেখেই হার্টের কোষের খবর নিতে পারলে সব চেয়ে ভাল হয়। এর জন্য লস্এঞ্জেলসে কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তা বেশ অভিনব। তাঁরা সিলিকন-অক্সাইড দিয়ে দুটি অতি ক্ষুদ্র কেন্টিলিভার বিম তৈরি করেছেন। সাঁতারুরা ডাইভ দেবার সময় এক কিনারায় আটকানো অন্য কিনারায় উন্মুক্ত যে রকম তক্তা ব্যবহার করেন, সেই আকৃতির ব্যবস্থাকে বলা হয় কেন্টিলিভার বিম। এই বিমগুলোর এক প্রান্তে জীবকোষের সঙ্গে আটকাবার জন্য এক ধরনের ক্ল্যাম্প থাকে। তাদের অন্য প্রান্তে থাকে কেলাসিত সিলিকনের তৈরি ষ্ট্রেইনগেজ যা বলপ্রয়োগের ফলে বিমের বক্রতাটা সূক্ষ্মভাবে মাপতে পারে। বাঁকার ফলে সিলিকনের বৈদ্যুতিক রোধকতায় পরিবর্তন ঘটাতেই এরকম পরিমাপ সম্ভব হয়। শুরুতে পরীক্ষা-নিরিক্ষার সময় ইঁদুরের হার্ট থেকে একটি কোষ নিয়ে তা বিমের ক্ল্যাম্পে আটকানো হয়েছে। এখন ঐ কোষে পর পর ঘন ক্যালশিয়াম দ্রবণ ও পাতলা ক্যালশিয়াম দ্রবণ পাম্প করে তার সংকোচন-প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে যে বল প্রয়োগ বিমের উপর হয় তা ষ্ট্রেইনগেজ সূক্ষ্মভাবে মাপতে পেরেছে। দেখা গেছে বিভিন্ন হার্ট কোষে এর ফলে ১০০ ন্যানো-নিউটন থেকে ৫০ মাইক্রো-নিউটন পর্যন্ত ক্ষুদ্র বল এভাবে প্রয়োগ করে থাকে। বলের পরিমাণ থেকে কোষের অবস্থাও অনুমান করা যায়। মজার ব্যাপার হলো এভাবে যে ক্ষুদ্র-মেশিন তৈরি হলো তা আগাগোড়া সিলিকন প্রযুক্তির মাধ্যমে করা হয়েছে। বর্তমানে সিলিকন চিপের ভিত্তিতে আইসি তৈরির যে বিশাল প্রচলিত শিল্প রয়েছে, তার মধ্যেই এরকম সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গির জটিল ও ক্ষুদ্র যন্ত্র তৈরি সম্ভব হচ্ছে-এটিই সব চেয়ে সম্ভাবনাময় ব্যাপার। ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির মেশিন এভাবে চলে যাচ্ছে শরীরের একেবারে কোষের পর্যায়ে- যেখানে এক একটি কোষের পরিবর্তনের উপর এটি নজরদারী করতে পারবে। এ সম্পর্কে প্রাথমিক একটি লক্ষ্য হলো হাইপোট্রপিক হার্টের বিষয়ে গবেষণা করা। সাধারণত উচ্চ রক্তচাপ ও অনুরূপ নানা কারণে বেশি কাজ করতে গিয়ে হার্টের কোষ বড় ও অফিস সবল হয়ে পড়ে (যার ফলে হার্টটিও বড় হয়)। এর ফলশ্রুতিতে অবশ্য কোষটি দ্রুত বিকল হয়ে পড়ে। এভাবে মরা কোষের কারণে হার্ট এটাক হয়ে থাকে। এরকম বড় হয়ে যাওয়া হার্টকে হাইপোট্রপিক হার্ট বলা হয়। ক্রমে এভাবে অধিক কাজ করে বড় হতে থাকলে রুগী হার্টএটাকের সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে যায়। অথচ কোষ পর্যায়ে উদ্ভাবিত নূতন ক্ষুদ্র মেশিনের সাহায্যে শুরু থেকেই

এরকম কোষের উপর নজর রাখা সম্ভব। তখন কিছু কোষে প্রবণতাটি দেখা দিলেই অনায়াসে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে, পুরো হার্টে ব্যাপারটি ছড়িয়ে পড়ে জটিল আকার ধারণ করার আগেই।

জীব-কোষের মধ্যে ফ্যাক্টরি

এখন কেউ কেউ চেষ্টা করছেন মানুষের স্বাভাবিক কোষকেই ন্যানো প্রযুক্তির মাধ্যমে ওষুধের ক্ষুদ্র ফ্যাক্টারিতে পরিণত করতে। এখানে কার্যকর হবে ন্যানো পর্যায়ের কিছু ইলেকট্রনিক সার্কিট যা সরাসরি কোষের উপর কাজ করে কাঙ্খিত ওষুধ ওখানেই তৈরি করবে। ঐ সার্কিট কোষকে উদ্দীপ্ত করে এ ওষুধ সৃষ্টি করবে। সে সঙ্গে তখনই দেখা দেবে ঐ ফ্যাক্টরীতে ন্যানো মেশিনের আরো কাজ। যেমন কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রপেলার সমেত যে ন্যানো মেশিন তৈরি হয়েছে সেটি তখন দরকার হবে তৈরি ওষুধ অণুগুলো কোষের কাছ থেকে কুড়িয়ে দ্রুত সরিয়ে ফেলার কাজে। এটি না করা হলে ওষুধের ক্রিয়া তার উৎস কোষটির ক্ষতি করতে পারে। কাজেই ঐ ন্যানো মোটরটির সঙ্গে ১০০ ন্যানোমিটার বড় একটি ঘুরন্ত পর্দা ওষুধকে কুড়িয়ে নেবে। পর্দার উপর থাকা সুর্নির্দিষ্ট কিছু এন্টিবডি ওষুধের অণুগুলো আটকিয়ে নিয়ে ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে একটি আলাদা চেম্বারে জমা করবে। এমনিতরো বিভিন্ন রকম মেকানিক্যাল কাজ– সরানো, কুড়ানো, কাটা, ছেরা ইত্যাদি এরকম ন্যানো মেশিনের দ্বারা সম্ভব হবে।

আগেই দেখেছি ঐ ন্যানো মোটর চলে কোষের মধ্যে জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরি শক্তি দিয়ে। কোষের এ টি পি নামক দ্রব্য ভেঙ্গে গিয়ে ওখানে প্রোটিনের একটি অংশ ঘুরতে থাকে। এই ঘূর্ণনকেই ন্যানো মোটরে শক্তি যোগাতে ব্যবহার করা হয়। এখন কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বেশ কয়েকটি ন্যানো মোটরকে একত্র করে তাদের ঘূর্ণনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ তৈরির ব্যবস্থা করতে চান। কোষের মধ্যেই উৎপাদিত এই বিদ্যুৎ সেখানে অন্যান্য ন্যানো প্রযুক্তিতে শক্তি যোগাবে। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা নিজেরাও অবশ্য এরকম গবেষণার সমস্যাসংকুল দিনগুলো সম্পর্কে বেশ সচেতন। যদিও বৈদ্যুতিক সার্কিট, ওষুধ নিঃসরণ ব্যবস্থা ইত্যাদি নিশ্চল যন্ত্র হিসাবে ন্যানো প্রযুক্তি এখনই খুব বাস্তব অবস্থায় রয়েছে-ঠিক মেশিন বা মোটর হিসাবে বাস্তবে ব্যবহারযোগ্য হতে তাকে অনেকগুলো কারিগরি সমস্যা পেরিয়ে যেতে হবে। এখন যে মোটর তৈরি হয়েছে তার দক্ষতা ১ থেকে ৪ শতাংশের বেশি নয়। কাজের উপযোগী হতে হলে তাকে ৯৯ শতাংশেরও বেশি দক্ষ হতে হবে। তাছাড়া বর্তমানে যে পদ্ধতিতে বিজ্ঞানীর

হস্তক্ষেপে পরমাণু সাজিয়ে সাজিয়ে ন্যানো মেশিন তৈরি হয়েছে তাতে চলবেনা। শরীরের জীবকোষের মধ্যে একটি প্রোগ্রাম অনুসরণ করে আপনা থেকে এভাবে মেশিনের এসেম্বলী হয়ে যেতে হবে অনেক সংখ্যায়। ন্যানো মেশিন তৈরি আর কোষের কার্যপ্রণালীর মধ্যে সীমারেখাটিই তখন যেন লোপ পাবে। এটিই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্য আরো প্রচুর গবেষণার প্রয়োজন। গবেষণায় প্রয়োজন প্রচুর অর্থব্যয়ের। সাধারণভাবে সে রকম অর্থের অভাব অবশ্য হচ্ছেনা। হিউলেট প্যাকার্ড, আই বি এম, থ্রি এম প্রভৃতি বড় বড় কোম্পানী ইতোমধ্যেই তাদের সিংহভাগ গবেষণা ব্যয় ন্যানো-প্রযুক্তির ক্ষেত্রেই করছে। ইঞ্জিন অব ক্রিয়েশনের অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্খী পরিকল্পনার কথা যদি বাদও দিই, যে কোন ধরনের কার্যকর ন্যানো মেশিন– যা ঘুরবে, চলবে, কাজ করবে– তার জন্যেও প্রয়োজন আরো ব্যাপক গবেষণার। কিন্তু এসবের মাধ্যমেই ফাইনম্যান ও ড্রেক্সলারের কিছু কিছু স্বপ্ন সত্যি সত্যি বাস্তবায়নের পথে চলেছে।

যে সফ্‌টওয়্যার নিজেই গজাবে

জীব-বিবর্তনের অনুকরণ

ছোটবেলায় অংক না পারলে স্যার রাগ করে বলতেন অংক গাছে ধরে না, এটি কষ্ট করে শিখতে হয়, নিজে করতে হয়। তখন ভাবতাম আহ্ ওরকম একটি গাছ থাকলে মন্দ হতনা, গাছে ধরা অংক যদি সরাসরি পাওয়া যেত! উদ্যান বিদ্যায় আমরা যতই বাহাদুরি নিইনা কেন ফলাবার মূল কাজটি কিন্তু উদ্ভিদই করে—ঐ কাজ আমরা করার কথা ভাবতেও পারিনা। কেমন সেই কাজ? ছোট্ট বীজটি থেকে গাছ বড় হয়ে ফুল-ফলে সমৃদ্ধ হবার কাজ। ওভাবে বিকশিত হবার সব পরিকল্পনা ঐ বীজের মধ্যেই থাকে। আবার ঐ বীজটাও এসেছে তার পূর্ব পুরুষের কাছ থেকে— পরিকল্পনাগুলো বংশ পরম্পরায় এভাবেই এসেছে। শুধু এসেই ক্ষান্ত হয়নি, ক্রমে উন্নতও হয়েছে। এই ক্রমোন্নতিকে আমরা বলি জীব-বিবর্তন। তার একটি প্রক্রিয়া রয়েছে। বংশগতির গুণাগুণগুলো এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে যা বহন করে নিয়ে যাচেছ্ তাকে আমরা বলছি 'জিন'। প্রক্রিয়াটি জেনেটিক প্রক্রিয়া। এর মধ্যে উন্নয়নটিও হচেছ জিনে কিছু কিছু পরিবর্তন দৈবভাবে হচ্ছে বলে এবং সেই পরিবর্তনগুলোর মধ্যে ভালগুলো টিকে যাওয়ার মধ্য দিয়েই। এখন আমরা অন্য কিছুও নিজে না করে 'গাছে ধরা' অবস্থায় পেতে হলে জীবের সেই জেনেটিক প্রক্রিয়ার মতই কোন প্রক্রিয়া শুরু করে দিতে পারতে হবে। সত্যিই যদি তা পারি তা হলে অংকের মত জিনিসও শুধু যে নিজ থেকে গজাবে তা নয়, বিবর্তনের মাধ্যমে পর পর প্রজন্মগুলোতে আরো উন্নত জাঁদরেল সব অংক এভাবে পাওয়া যাবে।

'জীবন্ত' সফ্‌টওয়্যার

তবে এখন আমরা ছোটবেলার ছাত্রটির মত স্কুলের অংক নিয়ে ভাবছিনা। ভাবছি কম্পিউটারের প্রোগ্রাম বা সফ্‌টওয়্যারের কথা। অনেক মাথা খাটিয়ে, পরিশ্রম করে এখন এক একটি সফ্‌টওয়্যার তৈরি করতে হয়। যত জটিল সফ্‌টওয়্যার, পরিশ্রম তত বেশি। সফটওয়্যার নিজেই যদি অন্য সফ্‌টওয়্যার তৈরি করতে পারত তা হলে সেটি গাছে ধরার মতই তো ব্যাপার হতো। শুধু সফ্‌টওয়্যার তৈরি করার পরিশ্রমটাই আমাদের একমাত্র যন্ত্রণা নয়। আমরা এত কষ্ট করে যে সফ্‌টওয়্যার লিখি তাকে খুব কড়াকড়ি কিছু সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয়। একটু এদিক ওদিক হলেই ঐ সীমা পার হয়ে সফ্‌টওয়্যার ক্র্যাশ করে। এও কি কম যন্ত্রণা! এত বড় ও সুন্দর সফ্‌টওয়্যারের মধ্যে ছোট্ট দু'একটি উকুন (কম্পিউটারের ভাষায় 'বাগ') থেকে গেলে সেখান থেকেই ধ্বসে পড়তে পারে পুরো জিনিসটি। আর জটিল সফ্‌টওয়্যারের সব উকুন-বাছার কাজটি একা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের নিজের ব্যবহারের কম্পিউটারে এরকম উকুন-ওয়ালা সফ্‌টওয়্যারের পাল্লায় পড়লে বিরক্তি উৎপাদনটাই হয়তো বড় ক্ষতি। কিন্তু গাড়ির ব্রেক নিয়ন্ত্রণের কাজে বা বিমান চালনার কাজে ব্যবহৃত সফ্‌টওয়্যার যদি ওরকম ক্র্যাশ করে, তা হলে কি ভয়াবহ অবস্থাই না হতে পারে– কি দারুণ ঝুঁকির কথা!

এসব যন্ত্রণা আর ঝুঁকির কথা মনে রেখে অনেকে এখন সত্যি সত্যি সফটওয়্যারকে গাছের মতই গজাবার কথা ভাবতে শুরু করেছেন। শুধু ভাবাই নয় বেশ কিছু কাজও এগিয়ে গেছে এই দিকে। ব্যাপারটি যখন সম্ভব হবে তখন কম্পিউটার প্রোগ্রামারদের কাজ সম্পূর্ণ বদলে যাবে। এখন যদি তাদের কাজ হয় মেকানিকের মত, তখন তাদের কাজ হবে মালির মত। মেকানিক যন্ত্র তৈরি করেন নিজের হাতে– লোহা বা তেমনি কিছু কেটে চিরে জোড়া দিয়ে বহু পরিশ্রমে। এর মধ্যে গলদ দেখা দিলে সেটিও তাঁকে সারতে হয় নিজের হাতেই। আর মালি শুধু গাছকে বড় হতে সহায়তা দেন। বড় হবার যে প্রক্রিয়া তা গাছ নিজেই সম্পন্ন করে। গাছের শাখা-প্রশাখা, ফুল বা ফল মালি নিজে তৈরি করেন না। এটি গাছের নিজের জৈব প্রক্রিয়ায় আপনা থেকেই বিকশিত হয়। সেই প্রক্রিয়ায় অন্তর্নিহিত কোন ত্রুটি থাকলে সেটি সারাবার কাজও গাছের নিজের। সফ্‌টওয়্যারের যে বিকল্প জগতের কথা বলছি সেখানেও তাকে কেউ ডিজাইন করবেনা, তৈরি করবেনা, বরং সে নিজেই বিকশিত হবে এবং বিবর্তিত হবে- উদ্ভিদের মতই। প্রোগ্রামার শুধু মালির মত একে বিকশিত হবার সুযোগ করে দেবে নিজের কম্পিউটারে , 'বীজ' লাগাবে, প্রয়োজনমত 'ছাটাই' করবে ইত্যাদি।

এর অর্থ শুধু যে পরিচর্যা মাত্র দিয়ে অনেক রকম সফ্‌টওয়্যার আপনা থেকে পাওয়া যাবে তাই নয়। মানুষের প্রোগ্রাম করা সফটওয়্যারকে যে কড়াকড়ি সীমার মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়, সেই বিষয়টি থেকেও এটি মুক্তি পাবে। জীবন্ত উদ্ভিদের মতই এটি পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে নিজকে খাপ খাইয়ে বদলে নেবে, ত্রুটি দেখা দিলে তাও সংশোধন করবে। যতই দিন যাবে, পরবর্তী প্রজন্মের সফটওয়্যারগুলো আপনা থেকেই আরো সক্ষম, আরো উন্নত হবে। যেমন কম্পিউটার ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করতে করতে এটি নিজকে প্রতিরোধী করে তুলবে, অথবা কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের নানা খামখেয়ালীপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সেগুলোকে অতিক্রম করতে শিখবে। অর্থাৎ কিনা মানুষের তৈরি জড় সফটওয়্যার না হয়ে এটি এখন জৈব প্রক্রিয়ার অনুকরণে 'জীবন্ত' হয়ে উঠবে।

ডিজিটাল 'জিন'

কম্পিউটার জগতে স্বয়ং-চালিত বিবর্তন আনার এই চেষ্টাটি কিন্তু একেবারে নূতন কথা নয়। প্রথমে এটি শুরু হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইনে উন্নয়ন আনার চেষ্টা, কাটাকুটি খেলা বা দাবা খেলার মত গেইমসে কম্পিউটারের ক্রমপারদর্শিতা সৃষ্টির চেষ্টা– ইত্যাদিতে। এখানেও মূলত জৈব বিবর্তনকে অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

কম্পিউটার একটি সমস্যার সমাধানে বেশ কিছু বিকল্প সমাধান রাখে যা সম্পূর্ণ সমাধানের নানা টুকরা অংশ হতে পারে। কম্পিউটার কতগুলো সক্ষমতার বিচারে এর কোনটার উপযুক্ততা কত তা প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে নির্ণয় করে। যেগুলো অধিক উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে সেগুলোর মিশ্রণ থেকে দৈব চয়ন করে সে পরবর্তী প্রজন্মের সমাধানের অংশ হিসাবে সেগুলোকে ব্যবহার করে। এভাবে যে সব টুকরা-সমাধান এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে গিয়ে পৌঁছে সেগুলোকে আমরা বলতে পারি বিবর্তন প্রক্রিয়ার সফল 'জিন' (জৈব বিবর্তনের নামকরণ অনুসরণে)। এগুলোর কারণে নূতন প্রজন্মের সমাধান অনেকটা তার পূর্ব-প্রজন্মেরটির সঙ্গে মিল রাখবে বটে তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের থেকে আলাদাও হবে– আমরা যেমন বাবা মা'র মত হয়েও কিছুটা আলাদা হই। যতই প্রজন্ম এগোয় ততই ভাল থেকে আরো ভাল সমাধান আমরা পেতে থাকবো।

জেনেটিক প্রোগ্রামিং

এই বিবর্তন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে গবেষকরা ইতোমধ্যেই কম্পিউটার সৃষ্ট মিউজিক, ইলেকট্রনিক সার্কিট, রোবট, গেইম্‌স ইত্যাদির ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন।

এভাবেই তাঁরা এই ক্ষেত্রগুলোতে ক্রমেই আরো উন্নত ও পারদর্শি নমুনা আপনা থেকে বিকশিত হতে দিতে পেরেছেন। সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে বিবর্তনের ব্যবহারের চেষ্টা অবশ্য অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক। বছর দশেক আগে জেনেটিক প্রোগ্রামিং নামে এক ধরনের চেষ্টা হয়েছিল বটে, কিন্তু তার সাফল্য ছিল খুব সরল কিছু সফটওয়্যারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যে সব জটিল সফটওয়্যার প্রোগ্রামাররা সাধারণ পদ্ধতিতে লিখছেন সেগুলোর জটিলতার কাছাকাছি এই জেনেটিক প্রোগ্রামিং যেতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে প্রোগ্রামিং এর যে মৌলিক উপাদান - যোগ ও গুণনের মত গাণিতিক প্রক্রিয়া, বারংবার ঘুরে ঘুরে একই কাজ করার লুপ– ইত্যাদি প্রোগ্রামিং ষ্টেটমেন্টকে 'জিন' হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। 'বিবর্তনের' মাধ্যমে এগুলোকে একটি সম্পূর্ণ প্রোগ্রামে বিকশিত করা হয়েছে। এ প্রোগ্রামের আউটপুটকে কতগুলা আদর্শ আউটপুটের সেটের সঙ্গে তুলনা করা হয়। আদর্শ আউটপুটের সঙ্গে যেগুলো বেশি মিলেছে সেগুলোকে ভাল মনে করে তার উপাদানগুলোকে পরবর্তী প্রজন্মে এগুতে দেয়া হয়েছে। কিন্তু পওে বোঝা গেছে যে উন্নয়নের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাটি না থাকাতে জেনেটিক প্রোগ্রামিং বেশিদূর এগোতে পারেনি। এজন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বিবর্তনমূলক প্রোগ্রামিং এর নূতন একটি ধারা।

একটি উদাহরণ দিয়ে নূতন ধারার সঙ্গে আগেকার জেনেটিক প্রোগ্রামিং এর পার্থক্যটি বুঝার চেষ্টা করা যাক। ধরা যাক আমরা সুর-সৃষ্টির একটি সফটওয়্যার তৈরি করতে চাচ্ছি। জেনেটিক প্রোগ্রামিংএ এর জন্য সুরের বিভিন্ন নোটকে 'জিন' হিসাবে ব্যবহার করা হবে। প্রথম নোটের তীক্ষ্ণতা ও স্থায়িত্ব কালকে প্রথম জিনের মধ্যে ধারণ করা হবে, দ্বিতীয় নোটেরগুলো দ্বিতীয় জিনে ধারণ করা হবে - ইত্যাদি। শ্রোতার কাছে সঙ্গীতের মাধুর্যের বিচারে বিবর্তনের মাধ্যমে এসব বিভিন্ন জিন থেকে ভালগুলো চয়ন করে সুন্দর সুর বিকশিত হবে। যদি আরো দীর্ঘ সুর পেতে চাই তা বলে আরো কিছু সঙ্গীত-নোট সংজ্ঞায়িত করে নূতন কিছু জিন এর মধ্যে ঢুকাতে হবে। সরল, স্বল্প স্থায়ী সুরের জন্য এ ব্যবস্থাটি মন্দ নয়। কিন্তু মনে করি আমরা পুরাদস্তুর একটি সিম্ফোনি পেতে চাই। সেক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন নোটরূপী 'জিন' প্রয়োজন হবে। কম্পিউটার-বিবর্তনের একার পক্ষে এত বড় সংখ্যা নিয়ে কাজ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। আরো বড় চ্যালেঞ্জ হলো যে স্বরলিপিতে এ সঙ্গীত লেখা হয়েছে তার অংশ বিশেষ যদি নষ্ট হয় বা হারিয়ে যায় এবং তারপরও যদি পুরো সিম্ফোনিটি সঠিক ভাবে পেতে চাই। যেমন মনে করি কালি পড়ে মাঝে মাঝের এক তৃতীয়াংশ স্বরলিপিই অপাঠ্য হয়ে পড়েছে, এখনো পুরো সুর পেতে চাই। অর্থাৎ কোন না কোন ভাবে ঐ অল্প সুর ক্রমে সিম্ফোনিতে বেড়ে উঠার সুযোগ এর বিবর্তনে থাকতে হবে - যা হারিয়ে যাওয়া সুরগুলোকেও পূরণ করতে সক্ষম। জৈব প্রক্রিয়ায় এটি নিত্যনৈমত্তিক ঘটনা। যেমন গাছের শাখা ভেঙ্গে

গেলে নূতন শাখা আপনা থেকেই গজায়। কিন্তু প্রথম যুগের জেনেটিক প্রোগ্রামিংএ এর ব্যবস্থা ছিলনা। সেখানে একটি জিন সুরের একটি মাত্র নোটের ব্যবস্থা করে অথবা কম্পিউটার প্রোগ্রামের একটি কমাণ্ডের সৃষ্টি করে। জৈব প্রকৃতিতে কিন্তু এক একটি জিন বিকাশমান প্রক্রিয়ার এক একটি নির্দেশ নামা। এক্ষেত্রেও তা হতে হবে। একটি ডিজিটাল জিন এমন একটি ক্রমধারা সৃষ্টি করতে হবে যেন একটি জটিল সৃষ্টি তাতে সম্ভব হয়।

ডিজিটাল 'প্রোটিন' ও ডিজিটাল 'কোষ'

জৈব প্রকৃতিতে এরকম জটিল সৃষ্টি হয় জিনের নির্দেশে প্রোটিন তৈরি করে যা দেহাবয়ব গড়ে তোলে। এই প্রোটিন সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে - এমনকি জিনের কার্যকারিতার সুইচ অন্ করা অফ করার কাজটিও তার। এরাই কোষকে বলে দেয় সে কখন সংখ্যাবৃদ্ধি করে কী রূপ লাভ করবে। প্রোটিনের সঙ্গে জিনের , প্রোটিনের সঙ্গে কোষের, কোষের সঙ্গে কোষের - জটিল মিথষ্ক্রিয়াতেই বহুকোষী প্রাণীর জীবন গড়ে ওঠে।

কম্পিউটার প্রোগ্রামের ক্ষেত্রেও এমনটি সৃষ্টি করতে পারলে সন্তোষজনক বিবর্তন দেখা দেবে। একটি জিনের কার্যকারিতা শুরু হয় যখন সঠিক প্রোটিন এর বিশেষ অংশের সঙ্গে খাপ খায় তখন। এটি যেন কম্পিউটার প্রোগ্রামে IF শর্তের পূরণের মতো IF-THEN ষ্টেটমেন্টে যা প্রকাশিত– 'এমনটি হলে তেমনটি কর'। তখনই জিন নিজের প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে। কাজেই পুরো ব্যাপারটির একটি ডিজিটাল রূপ হতে পারে ডিজিটাল 'জিনের' এক অংশে থাকবে একটি ডিজিটাল 'প্রোটিনের' কোড। স্টেটমেন্টটি এক্ষেত্রে হবে: 'ঐ প্রোটিনের কোড উপস্থিত থাকলে এবং জিনের পরের অংশে দেয়া কোডে সেই প্রোটিনের ঘনত্বের সঙ্গে মিললে তবে জিনের তৃতীয় অংশে দেয়া কোড যে প্রোটিনটির প্রতিনিধিত্ব করছে তা সৃষ্টি কর'। এভাবে তথ্য সম্ভাবের মধ্যে সব জিনের এ সব কোড এক সঙ্গে একটি তালিকার আকারে থাকতে পারে। এদের কার্যকারিতা শুরু হয়ে গেলে 'জিন' তখন 'প্রোটিন' সৃষ্টি করবে। এসব প্রোটিন আবার অন্য জিনের উপর শর্ত হিসাবে কাজ করবে– এ ভাবে প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।

আমাদের সফটওয়্যার বিবর্তনের সিস্টেমের মধ্যে এমন কিছু ডিজিটাল কোড থাকবে যারা সক্রিয় হওয়ার পর প্রোটিন তৈরির বদলে বরং তার ডিজিটাল 'কোষের' কাজের ধরণ ঠিক করে দেবে। যেমন এরকম একটি জিন তার 'কোষকে' বলে দিতে পারে নিজের একটি প্রতিলিপি তৈরি করতে (যা হবে জৈব কোষের বিভাজনের সমতুল্য) অথবা বিশেষ কোন কার্য সামাধা করতে (যা হবে

জৈব কোষের স্নায়ু কোষ অথবা রক্ত কোষ বা এমনি কিছু বিশেষ কাজের কোষে পরিণত হওয়ার সমতুল্য)। এভাবে এরকম জিন তার ডিজিটাল কোষকে বিশেষ একটি সনাতন কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ফাংশন দিতে পারে। যেমন এরকম একটি জিন বলতে পারবে অমুক প্রোটিনটি যদি 'কোষে' উপস্থিত থাকে তাহলে তমুক প্রোগ্রামিংয়ে পরবর্তীর মানের সঙ্গে এক যোগ কর। এভাবে একটি 'কোষ' ও এক সেট জিন দিয়ে আমরা শুরু করলাম বটে, কিন্তু এর জেনেটিক নির্দেশ অনুযায়ী প্রতি প্রজন্মের পরিবর্তনে এটি কিছু কিছু পরিবর্তন হয়ে চলবে। এর ফলে যে বিবর্তিত প্রোগ্রাম সৃষ্টি হবে তা মানুষে করা প্রোগ্রামের কাজগুলো হয়তো করবে কিন্তু সেটি এমনভাবে করবে যা মানুষ প্রোগ্রামার চিন্তাও হয়তো করতে পারবেনা। এভাবে দেখা দেবে বিবর্তনের ফলে নানা সম্ভাবনাময় সফটওয়্যার।

প্রোগ্রামের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী

এই পদ্ধতি অনুসরণ করে ইতোমধ্যে রোবটের বুদ্ধিমত্তার ক্রমবিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়েছে এবং এর মধ্যে ত্রুটিগুলোও বিবর্তনের মাধ্যমেই দূরীভূত করে শেষ অবধি ত্রুটিহীন রোবট 'মস্তিষ্ক' পাওয়া গেছে। শুধু তা নয় এর বিকাশের সময় প্রয়োজনীয় কিছু কিছু 'জিন' অথবা 'প্রোটিন' সরিয়ে ফেলেও দেখা গেছে যে তাতে এর বিকাশের কোন অসুবিধা হয়নি। ভবিষ্যতে এ বিকাশের কাজ আরো অগ্রসর হলে বর্তমানে চালু সফটওয়্যার লেখার পাট এক সময় চুকে যেতে পারে। এখনো অবশ্য প্রচুর কারিগরি সমস্যা এর মধ্যে রয়ে গেছে। তাছাড়া এতে নিয়ন্ত্রণটি নিজের উপর না রেখে বিবর্তনের হাতে ছেড়ে দিতে হওয়াতে এবং পদে পদে গাণিতিক পরীক্ষার সম্মুখীন করে সফটওয়্যারকে যাচাই করে নেয়ার সুযোগ না থাকাতে বর্তমানের প্রোগ্রামাররা ঠিক এর উপর ভরসা রেখে উঠতে পারছেননা। কিন্তু ভরসা না রাখার কোন মানে হয়না। যেমন ধরা যাক বিমানের অভিজ্ঞ একজন পাইলট যে সব পরিস্থিতিতে সঠিক কাজটি করবেন এমন কথা আমরা গাণিতিক ভাবে প্রমাণ করতে পারবনা। তবুও আমরা তাদের যথেষ্ট ট্রেনিং দিতেই থাকি যতক্ষণ না তাদের উপর ভরসা করা যায়। একই দৃষ্টিভঙ্গী আমরা বিবর্তিত কম্পিউটার সফটওয়্যারের ক্ষেত্রেও নিতে পারি।

এরপর বিবর্তিত হার্ডওয়্যার

এই সব বললাম সফটওয়্যারের বিবর্তনের কথা। এর পরবর্তী লক্ষ্য হলো হার্ডওয়্যার অর্থাৎ কম্পিউটার, রোবট ইত্যাদি মেশিনের নিজ থেকে নিজে বিবর্তিত হবার বিষয়টি। সেটি যখন সম্ভব হবে এসব মেশিন তখন নিজ থেকেই গড়ে উঠবে,

নিজেই নিজের সক্ষমতা বাড়াবে, প্রয়োজনে নিজের মেরামত করবে এবং নিজের প্রতিলিপি সৃষ্টি করবে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এর উন্নয়নও হতে থাকবে। এখানেও জৈব বিবর্তনের প্রক্রিয়াটিকেই অনুসরণ করা হবে।

ওরকম কাণ্ডকারখানা এখনো ভবিষ্যতে থেকে গেলেও বিবর্তিত যন্ত্রপাতি যে কিছুই এখনো সৃষ্টি হয়নি তা কিন্তু মোটেই নয়। যুক্তরাষ্ট্রের নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবে বিবর্তনমুখি কম্পিউটিং ব্যবস্থায় খাপ খাইয়ে নেবার মত করে নানা হার্ডওয়্যার গড়ে তোলা হয়েছে যেগুলো স্পেস সিস্টেম ও রোবটে কাজে লাগছে। একই ভাবে নাসা বিবর্তনশীল এনটেনা সিস্টেম এবং স্বয়ং মেরামতকারী ইলেক্ট্রনিক বর্তনীও সৃষ্টি করেছে। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে একটি রোবট উদ্ভাবিত হয়েছে যেটি নিজ থেকেই নিজের চলাচলের উপায় উদ্ভাবন করতে পারে বিবর্তনশীল কম্পিউটিং এর মাধ্যমে। এ কাজে এটি কতগুলো আলাদা আলাদা অঙ্গ ব্যবহার করে। একটি অঙ্গ যদি কোন কারণে নষ্ট হয়ে যায় তখন এটি অন্য অঙ্গগুলো দিয়ে চলাচলের নূতন উপায় উদ্ভাবন করে নিতে পারে। জাপানে উদ্ভাবিত হয়েছে আরো চমকপ্রদ একটি বিবর্তনশীল রোবট। এর রয়েছে অনেকগুলো পৃথক অংশ যেগুলো পরস্পরের সঙ্গে নানা ভাবে সংযুক্ত হতে পারে। এই রোবট প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। যেমন হয়তো দুই পা 'গজিয়ে' হাঁটতে শেখা। আবার পরে অন্য রূপ নিয়ে পোকার মত হামাগুড়ি দিতে শেখা। এই প্রক্রিয়াটিতেই হয়তো শিগগির একদিন সম্পূর্ণ স্বয়ং ডিজাইন করা, স্বয়ং তৈরি হওয়া, স্বয়ং মেরামত হওয়া মেশিনের উদ্ভব হবে।

জৈব বিবর্তন ও জীবনের জেনেটিক প্রক্রিয়া এখন আমাদের সামনে একটি উজ্জ্বল আদর্শ। একে ডিজিটাল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনুকরণ করে নিজ থেকে সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার গজাবার স্বপ্ন এখন আমাদের চোখে। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে কাজেরও কোন ত্রুটি বিজ্ঞানীরা করছেন না আজ।

কাগজ কলমে তথ্য প্রযুক্তি

সেই মিশরের প্যাপিরাসের যুগে মানুষ যে কাগজ সংস্কৃতিতে প্রবেশ করেছিল তখন থেকে আজ পর্যন্ত তা শুধু বিকাশই লাভ করেছে, কখনো সংকুচিত হয়নি। এই দীর্ঘ সময়ে যখনই তথ্যের ও জ্ঞানের প্রশ্ন উঠেছে তখনই কাগজ কলমের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে কম্পিউটার এবং ইন্টার-একটিভ ডিজিটাল তথ্যায়নের উন্নয়ন এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করেছে যে কাগজের পাট চুকে যেতে চলেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত তেমন কোন লক্ষণ বাস্তবে দেখা যায়নি। বরং কম্পিউটার নূতন করে কাগজের আরো চাহিদার সৃষ্টি করেছে এবং কাগজের ব্যবহার এই নূতন সংস্কৃতিরও অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। কাগজবিহীন দফতর চালু হবে এমন একটি আশা অলীক আশা হিসাবেই থেকে গেছে। অথচ সেই আশার মধ্যে অনেকগুলো সঙ্গত কারণ ছিল। একটি ই-বই অথবা একটি পি.সি কে তথ্য ভাণ্ডার হিসাবে আমরা যত বিচিত্র ভাবে ব্যবহার করতে পারি, ইচ্ছেমত এই তথ্যের সঙ্গে নিজের মিথস্ক্রিয়া ঘটিয়ে একে ইন্টার-একটিভ করে তুলতে পারি– কাগজের বইয়ে বা দলিলে তা সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও পড়ার জিনিস কাগজের না হলে, আর কলম দিয়ে মনের সুখে লিখতে বা আঁকতে না পারলে আমাদের অধিকাংশেরই মন ভরেনা। কাগজ কলমের প্রতি আমাদের এই পক্ষপাতিত্ব কেন সেটি বুঝে উঠা দুরূহ। তবে এটি যে শুধু দীর্ঘদিনের অভ্যাসজাত নয় সেটি সম্পর্কে এখন সবাই প্রায় নিশ্চিত।

সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে মানুষের সঙ্গে কাগজের একটি শারীরবৃত্তীয় সম্পর্ক রয়েছে। এখানে আমাদের হাতের একটি ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। বই পড়ার সময় ধরতে, পাতা উল্টাতে আমরা যে ভাবে দুটি হাতের ব্যবহার করি তার মধ্যে একটি মৌলিক অন্তরঙ্গতা রয়েছে– যা ই-বই বা পি.সির মাধ্যমে

পাওয়া যায় না। বইয়ে ধারণকৃত তথ্যকে আত্মকৃত করতে কাগজের সঙ্গে আমাদের হাতের একটি বিশেষ মিথস্ক্রিয়া রয়েছে যার স্বরূপটি এখনো উন্মোচিত হয়নি। কাগজ নিয়ে কাজ করার সময় আমরা কলমকে লেখার কাজে, দাগ দেয়া বা পাশে নোট করার কাজে ব্যবহার করা ছাড়াও অন্য রকম ভিন্ন ভাবেও ব্যবহার করি; যেমন- লেখার উপর কলম বুলিয়ে যেতে, কলম দিয়ে ইঙ্গিত করতে অথবা শুধু টেবিলের উপর আনমনে টোকা দিতে ইত্যাদি। এর সবই কোন না কোন ভাবে তথ্য লেনদেন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। আর এসব শুধু সনাতন শিক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত মুদ্রা-দোষ বলে উড়িয়ে দেবারও উপায় নেই। দেখা গেছে যে এটি মানুষ কয়েক হাজার বছরের পড়া ও লেখার কাজের মাধ্যমে মানব-আচারের অঙ্গীভূত করে ফেলেছে এবং এর মাধ্যমে খুবই সফল একটি যোগাযোগ ব্যবস্থাও গড়ে তুলেছে। এখন আকর্ষণীয় বিকল্প প্রযুক্তি আসলেই তার পরিবর্তে অন্য রকম আচারে চলে যাওয়া– দু'এক বছরে বা এমনকি দু'এক পুরুষে সহজ নাও হতে পারে।

অসুবিধার কথা হলো ঐতিহাসিক ভাবে আমাদের শারীরবৃত্তীয় ভাবভঙ্গীর দিক থেকে জোরালো অবস্থানে থাকলেও কাগজ কলম আজকের তথ্য প্রযুক্তি মান-দণ্ডের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছেনা। নিশ্চল, নীরব ইমেজকে একে অন্যের কাছে সঞ্চারের জন্য কাগজ বেশ ভাল। কিন্তু ইলেকট্রনিক মাধ্যম যেমন ইমেজকে সচল ও সরব করে তুলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বহুমাত্রা যোগ করতে পারে কাগজ তা পারেনা। সেক্ষেত্রে কাগজ ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া উভয়েই যদি পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধাগুলোর পরিপূরক হিসাবে একযোগে কাজ করতে পারে তা হলে অবস্থার অনেক উন্নতি হয়। এখন আমরা মোটামুটি তাই করছি কম্পিউটার ইমেজের প্রিন্টের ব্যবস্থা রেখে। কিন্তু এটিও সর্বোত্তম ব্যবস্থা নয়। সব চেয়ে ভাল হয় উভয়কে যদি 'এক দেহে লীন' করে ফেলা যায় - কাগজের মধ্যেই ডিজিটাল প্রযুক্তিকে নিয়ে এসে। তথ্যকে অন্তরঙ্গ করে নেয়ার জন্য 'লেখা পড়ার' বিষয়টির ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির নূতন বিপ্লবটি খুব সম্ভব এদিক থেকেই আসবে। আর যখন সাফল্য আসবে তখন কাগজ আর কম্পিউটার আমাদের জন্য একাকার হয়ে যাবে- এ দুয়ের সীমারেখাটি ক্রমেই আবছা হয়ে গিয়ে।

এমন দিন যখন আসবে, তখন আমরা হয়তো বর্তমানের মতোই খবরের কাগজ উল্টে পাল্টিয়ে পড়বো, ভাঁজ করে রাখবো। কিন্তু তার উপর বিজ্ঞাপনের ছকটি কলম দিয়ে পূরণ করে, সেটি কাঁচি দিয়ে কেটে ডাকযোগে পাঠাবার বদলে বরং সেখানেই অন্য রকম কলম দিয়ে টিক চিহ্ন দিয়ে দিলে বিজ্ঞাপন-দাতা কোম্পানীর কাছে ইলেকট্রনিক ভাবে তা পৌছে যাবে এবং পণ্যটি আমার জন্য দুদিন পর চলে

আসবে। অথবা রুগীকে এম্বুলেন্সে হাসপাতালে নেবার সময় নার্সের হাতে রুগীর অবস্থা চার্ট এখনকার মতই ধরা থাকবে; কিন্তু কলম দিয়ে রুগীর তথ্য ওখানে লেখার সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি কাজ হয়ে যাবে হাসপাতালের কম্পিউটারে সেসব তথ্য পৌঁছে যাবে- এবং রুগী পৌঁছার আগেই তার জন্য প্রস্তুতিগুলো নেয়া হয়ে যাবে। এগুলো একেবারে কষ্ট-কল্পিত ব্যাপার এখন আর নেই। বিশ্বজুড়ে অনেকেই কাজ করছেন এরকম একটি সময়ের জন্য।

এ কাজে একটি প্রথম পদক্ষেপ হলো কম্পিউটার সৃষ্ট ডিসপ্লেগুলোকে কাগজ-সদৃশ জিনিসের উপর সরাসরি নিয়ে আসা। একেবারে সাধারণ কাগজে হলেই সব চেয়ে ভাল- আমাদের আরাম-বোধের দিক থেকে। তবে সেটি করতে সময় লাগবে বলে আপাতত কাগজ-সদৃশ জিনিসেই কাজ হবে। বর্তমানের বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তির কম্পিউটার-মনিটরের পর্দায় যে সব উন্নত প্রযুক্তির ডিসপ্লে ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলো পাতলা নমনীয় প্লাষ্টিক পাতের উপর সৃষ্টি করার কাজ অনেকটাই এগিয়ে গেছে। এদিক থেকে ডিসপ্লে ক্রমেই কাগজের দিকে যাচ্ছে। এটি সাধারণত করা হয় ঐ পাতের পুরুত্বের দিকে একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র অথবা কারেন্ট প্রয়োগ করে পাতের উপর মাখানো সংবেদনশীল কিছুতে রঙের পরিবর্তন ঘটিয়ে। এক্ষেত্রে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে ঐ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগকারী ইলেকট্রনিক ড্রাইভিং ব্যবস্থাগুলোকেও সেই পাতের সঙ্গেই পাতলা করে লেপটে দেয়া যায়।

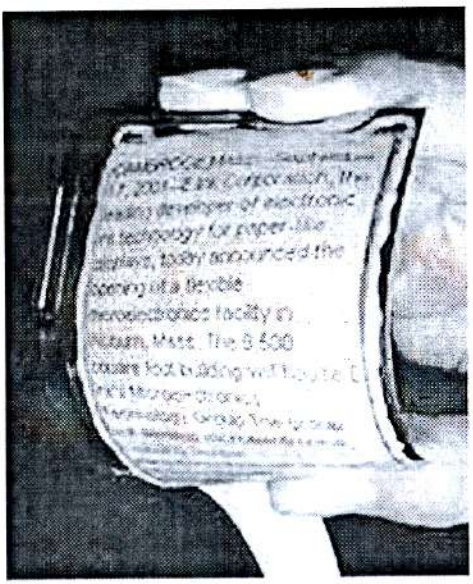

উন্নয়নকারী বিভিন্ন কোম্পানী এ কাজে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে দেখছে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রে মিশিগানের গাইরিকন কোম্পানী তার উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে প্লাষ্টিক পাতের উপর দুই-রঙা অতিক্ষুদ্র গোলক লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় ছড়িয়ে দিয়েছে। প্রত্যেকটি গোলকে রয়েছে বৈদ্যুতিক দ্বি-পোল। বিদ্যুৎ ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হলে এই দ্বিপোল বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে অনুসরণ করে ঘুরে নূতন অবস্থান নেয় আর সেই অবস্থানই ঠিক করে ওখানটায় দুই রঙের কোনটি দৃশ্যমান হবে - (যেমন সাদা বা নীল)। অন্যদিকে সুইডেনের কোম্পানী এক্রিয়ো এবং আয়ারল্যাণ্ডের এনটেরা নিচ্ছে অন্য কৌশল। এরা পাতের উপর যা মাখাচ্ছে তা বিভিন্ন রকম বৈদ্যুতিক চার্জ নিয়ে সেই অনুযায়ী ভিন্ন রঙ নেয়। ফিলিপ্স কোম্পানী আবার প্যাটেন্ট করেছে একটি বিদ্যুৎ-নিয়ন্ত্রিত 'ভেজা পদ্ধতি'। এতে সাদা পাতের উপর ছড়িয়ে দেয়া তেল-কালি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র অনুযায়ী কোন জায়গায় পাতকে সাদা রাখে বা কোন জায়গায় তাকে কালিতে ঢেকে দেয়। এখন পর্যন্ত এ পদ্ধতিগুলো নীল-সাদার মত দুটি রঙেই শুধু ডিসপ্লে সৃষ্টি করছে। তবে ইলেকট্রনিক ড্রাইভিং ব্যবস্থাকে আরো জটিল করে বহু রঙা ডিসপ্লেও শিগ্‌গির আসছে।

এ মুহূর্তে এগুলো বাজারে ওভাবে না আসলেও আসতে খুব দেরি নাই। শুরুতে হয়তো পত্রিকা, বইপত্র ইত্যাদিতে না গিয়ে এগুলোর দেখা মিলবে ব্যক্তিগত তথ্য রাখার পিডিএ অথবা টেলিভিশনের ক্ষেত্রেই আগে। এর মাধ্যমে গুটিয়ে রাখা বা ভাঁজ করে রাখার মত টিভি পর্দার উদ্ভব হবে। এসব পর্দা দিয়ে তখন ঘরের দেয়াল সাজানো যাবে। তাছাড়া আগামী দিনের টেলিভিশনকে এটি খবরের কাগজের মতই অন্তরঙ্গ করে তুলতে পারবে। যেভাবে আয়েশ করে ভাঁজ খুলে, ভাঁজ করে খবরের কাগজ আমরা ব্যবহার করি, এবং তাতে ছক পূরণ করি তেমনি সামনে টেলিভিশনের উপরও করা যাবে ঐ কাগজের মতই অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে। এভাবে নূতন প্রযুক্তিগুলোও চলে আসবে কাগজের মত ব্যবহারের সাবলীলতায়। কাগজকে কম্পিউটার যুগে পুরাপুরি নিয়ে আসতে হলে কাগজের সঙ্গেই আনতে হবে কম্পিউটারের মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ। অর্থাৎ কাগজ থেকে আমরা শুধু পড়বোনা, কাগজের উপর আমরা শুধু লিখবোনা, বরং পড়া ও লেখার মধ্য দিয়ে উৎসারিত করে দেব আরো নূতন নূতন অতিরিক্ত তথ্য সম্ভারের আয়োজন।

প্রথমেই অবশ্য কাগজের উপর লেখাকে সরাসরি কম্পিউটারে ধারণ করতে হবে। এটি অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজ। প্রথম পর্যায়ে তার উপর কলম দিয়ে লেখার সুযোগ দেয় এমন গ্রাফিক পাটাতনের মাধ্যমে এটি করা হয়েছে। এতে অবশ্য লেখার প্রক্রিয়ায় কলমের নড়াচড়া ও অবস্থান বুঝার জন্য কাগজের সঙ্গে জুড়তে হয়েছে

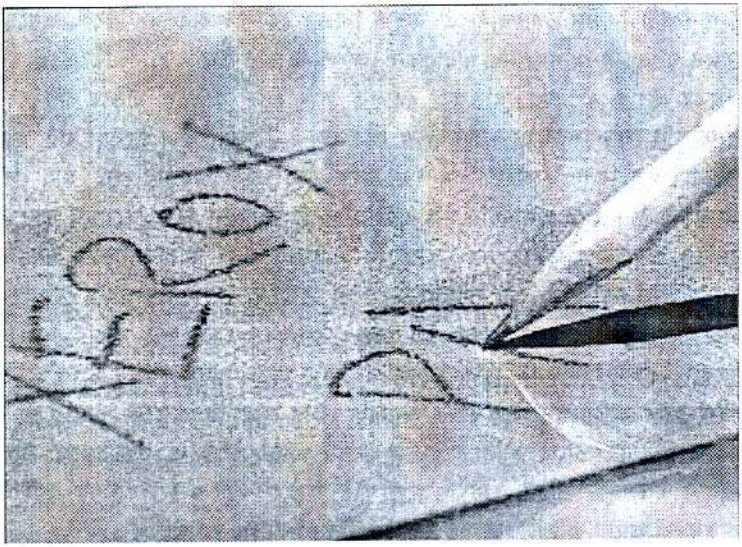

প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রনিক্স। কাজটি করা হয়েছে বিদ্যুৎ -চৌম্বক ব্যবস্থায়। এরপর এসেছে ভিডিও অনুধাবন পদ্ধতি। এতে লেখকের টেবিলের উপরে ছাদে ঝুলানো একটি ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে কলমের গতিবিধি রেকর্ড করা হয়। আরো পরে এসেছে ভিডিও'র পরিবর্তে আলট্রাসোনিক পদ্ধতি। জমি জরীপ করার সময় যেভাবে তিনটি নির্দিষ্ট বিন্দুর আপেক্ষিকে দেখে বিভিন্ন অংশের অবস্থান নির্ণয় করা হয় এখানেও তিনটি নির্দিষ্ট আলট্রাসেনিক উৎসের নিরিখে A4 সাইজের প্যাডের কাগজের উপর কলমের চলাচল নির্ণয় করা হয়। এ পদ্ধতিগুলো বেশ চালু হয়েছে বটে, কিন্তু এর প্রত্যেকটিতে ক্যামেরা, আলট্রাসোনিক ডিটেক্টর ইত্যাদি বহিস্থ যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। কলম চলাচলের স্থানাংক ব্যবস্থাও এই বহিস্থ যন্ত্রের দ্বারাই সুনির্দিষ্ট হয়। অথচ সর্বত্র বহনক্ষম কাগজের স্বাধীন ব্যবহার হতে হলে বহিস্থ যন্ত্রের উপর এই নির্ভরশীলতা থাকা উচিত নয়। এজন্য এখন বড় চ্যালেঞ্জটি হলো কাগজের উপর কলম চালানোর প্যাটার্নটিকে কম্পিউটার-বন্দী করার জন্য একটি সরাসরি ব্যবস্থা যা ঐ কাগজ-কলমের নিজের মধ্যেই সম্ভব হবে।

বর্তমানে এক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি বিশেষ ভাবে আশার আলো দেখাচ্ছে। একটি হলো সুইডিশ কোম্পানী আনোত এর পদ্ধতি, অন্যটি ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সম্মিলিত উদ্যোগের কোম্পানী পেপার প্লাস প্লাস এর পদ্ধতি। আনোত পদ্ধতিতে কলমের সঙ্গেই থাকে ছোট্ট একটি ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন ক্যামেরা। কাগজের উপর প্রায় অদৃশ্যভাবে পূর্ব-মুদ্রিত থাকে অসংখ্য বিন্দুর একটি প্যাটার্ণ যা ইনফ্রা-রেড

রশ্মি শোষণ করে। এর মধ্যে বিভিন্ন মুহূর্তে কলমের অবস্থানের স্থানাংক এমনভাবে রেকর্ড হয়ে যায় যাতে হস্তাক্ষরগুলো কম্পিউটার হুবহু অনুধাবন করতে পারে। স্বাধীন ভাবে এরকম A4 সাইজের চার পাঁচ পৃষ্ঠা লেখার তথ্য কলমেই জমা রাখার পর তার সব এক সঙ্গে কম্পিউটারে স্থানান্তর করা যায়।

পেপার প্লাস প্লাস পদ্ধতিতে কলমকে একটি মুদ্রিত কাগজের যে কোন অংশ ইঙ্গিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। মুদ্রিত কাগজের উপর প্রায় অদৃশ্য বিদ্যুৎ পরিবাহী কালিতে একটি বিন্দুর প্যাটার্ণ উপরি-মুদ্রণ করা থাকে। এর উপর দিয়ে কলম বুলালে কলম তার স্থানাংককে ফ্রিকোয়েন্সি-মড্যুলেটেড সিগন্যালে পরিণত করে কম্পিউটারে কিংবা অন্য যে কোন ডিজিট্যাল ব্যবস্থায় নিয়ে যায়। সেখানে কলমের অবস্থানের স্থানাংক অনুযায়ী বিভিন্ন পূর্ব নির্ধারিত ব্যাখ্যা, শব্দ, ভিডিও ক্লিপ, ছবি, ফোন নম্বর ইত্যাদি আমরা পেতে পারে। অর্থাৎ কাগজের উপর লেখা বা ছবির বিভিন্ন অংশ কলম দিয়ে নির্দেশ করে আমরা সেখানকার ম্যাসেজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শব্দ, ব্যাখ্যা, ভিডিও ইত্যাদি পেতে পারি। এভাবে নিশ্চল ও নীরব কাগজের লেখা সচল ও সরব তথ্যের ইন্টার-একটিভ বাহক হয়ে পড়তে পারে।

তথ্য প্রযুক্তির শিল্প ক্রমেই বুঝতে পারছে যে কাগজ কলমকে বাদ দিয়ে নয়, বরং কাগজ কলমের মাধ্যমেই এ প্রযুক্তিকে মানুষের আরো বেশি কাছে এনে দেয়া সম্ভব। তাই কাগজ কলমের মানবিক কার্যকারিতাকে কম্পিউটারের প্রযুক্তিগত দক্ষতার সঙ্গে যোগ করে দিয়ে এক্ষেত্রে একটি নূতন যুগের সূচনার জন্য সর্বত্র প্রচুর গবেষণা ও আয়োজন চলছে।

ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয় :
উচ্চ শিক্ষা আমূল পাল্‌টে দেবে

ক্যাম্পাসটি অনাবশ্যক

একেবারেই নিজের কাছে একান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবই আছে, শুধু সফটওয়্যারগুলো এখনো পুরাপুরি যুৎসই হয়ে উঠতে পারেনি। নইলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে এখন আর কোন বাধা রয়েছে বলে মনে হয়না। অনেকেই মনে করছেন সেই মধ্যযুগে অক্সফোর্ড বা সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় পত্তনের সঙ্গে যে রীতি এসেছিল শিক্ষকের বক্তৃতা শোনা, বিদ্যার্থীদের এক সঙ্গে থাকা, সামনা সামনি বসে পাঠ নেয়া– এগুলো মোটেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যাবশ্যক কোন অনুসঙ্গ হবার কথা নয়। তারও আগে নালন্দার বা তক্ষশীলার গুরুর সান্নিধ্যে সর্বক্ষণ বাস করে যে বিদ্যা চর্চা- সেই পাট তো চুকে গেছে বহু দিন। এখনো যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় বলতে একটি জায়গা বুঝি, ক্যাম্পাসের ভবনগুলো বুঝি সে নেহাতই আমাদের ঐ পুরাতন সংস্কার বশেই করে চলেছি মাত্র। ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয় যদি এখন সব ক্ষেত্রে চালু হয়ে যায় তা হলে ভবিষ্যতের গবেষকরা লাইব্রেরী ঘেঁটে আজকের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কথা পড়ে, ছবি দেখে কিছুতেই বুঝতে পারবেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ছাত্রাবাস, ক্যান্টিন, ক্লাসরুম ইত্যাদির কী সম্পর্ক থাকতে পারে; অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়ওয়ালারা এগুলো নিয়ে কেন পাগল হতো? হ্যাঁ তবে ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কথা যত হচ্ছে, কাজ তত দেখা যাচ্ছে না। এখনো এর সম্পর্কে আলোচনা, সেমিনার ইত্যাদি

আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় 'ভবনে' বসেই করতে হচ্ছে! সে তো ইন্টারনেটের উপর কনফারেন্সও মানুষ বিমানে বহু দূর ভ্রমণ করে কনফারেন্স হলে গিয়ে করছে- ইন্টারনেট বা ভিডিও কনফারেন্সিং এর সুযোগ নেবার কথা দিব্যি ভুলে গিয়ে। তার মানে কি এই যে সামনা সামনি বসে তর্ক-বিতর্ক না করতে পারলে আমাদের যুৎ লাগেনা? অনেকেই এটি মনে করেন বটে, কিন্তু ব্যাপারটি মোটেই তা নয়। সুযোগ পেলে আমরা ইতোমধ্যেই ভার্চুয়াল কনফারেন্স অথবা ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ঠিকই ঝুঁকে যেতাম। ঐ যে বলছিলাম, অভাব যা তা হলো এর জন্য লাগসই সফ্‌টওয়্যারের। অনেকে সফ্‌টওয়্যার তৈরি করছেন বটে, কিন্তু তা এখনো সম্পূর্ণতা পায়নি এবং ঠিকমত যথাযথও হয়নি।

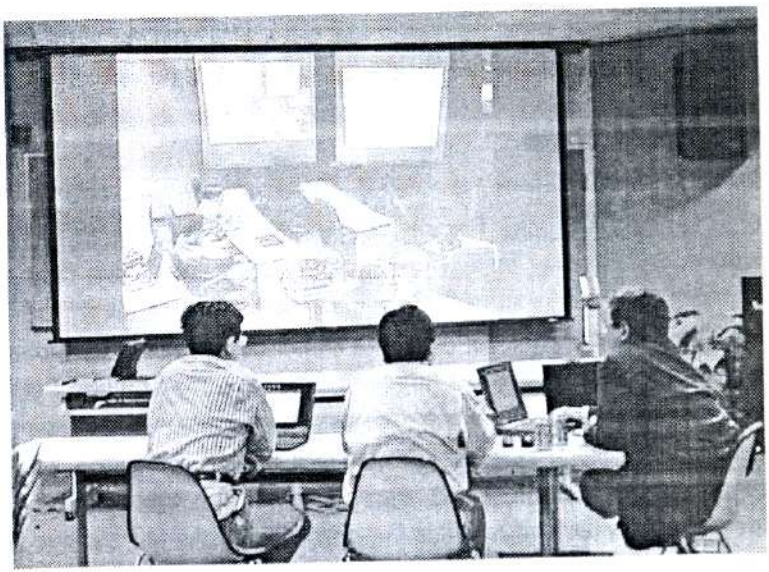

এর কোন কর্তৃপক্ষ নাই

বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বেশ খানিকটা পূর্ব ধারণা এ জন্য আমাদেরকে বিসর্জন দিতে হবে। আমাদের সনাতন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদেরকে কাষ্টমার মনে করে। ছাত্রদের চাহিদার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হয়, ওরা সেখানে বেতন দিয়ে পড়তে আসে। তার বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার সার্ভিস দিয়ে থাকে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার মধ্যে এরকম চিন্তা থাকতেই হবে এমন কোন কথা নেই। বরং বিশ্ববিদ্যালয়কে মনে করা যায় ছাত্রদের কর্মদ্যোগ–সেখানে তারা কাষ্টমার

নয়, বরং কর্মী। সনাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্ধতি যদি হয় শিক্ষক-ছাত্রের পদ্ধতির তা হলে ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়েরটি হবে ছাত্র-ছাত্রের পদ্ধতি। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সব জ্ঞানের উৎস থাকে বিশ্ববিদ্যালয় 'কর্তৃপক্ষের' দখলে– শিক্ষক, লাইব্রেরী, ল্যাব্যারেটরী ইত্যাদি। ছাত্ররা সেখান থেকে আহরণ করে। কিন্তু ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের খুব একটা দরকারই হবে না– কারণ জ্ঞানের উৎসের সে রকম কোন কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগারই থাকবে না। সে উৎস চলে যাবে এর সকল সদস্যের কাছে সমানভাবে– কোন মূল কেন্দ্র বা সার্ভার ছাড়াই। যেহেতু সে রকম সার্ভার থাকবেনা, সেহেতু সার্ভারকে স্থান দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের বা ক্যাম্পাসের প্রয়োজন হবে না। তা হলে ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিটি অনেকটা 'আমরা সবাই রাজা'র মত। সব সদস্যের এখানে সমান বিচরণ, সমান ক্ষমতা। নিজেদের কাজ করতে গিয়ে তারা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ভার্চুয়ালি মিলিত হবে।

তুলনাটি সেমিনারের সঙ্গে

কখনো কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সবার সাম্য বুঝাবার জন্য বলা হয় এখানে ছাত্ররা হচ্ছে জুনিয়র সদস্য এবং শিক্ষকরা সিনিয়র সদস্য। এই ধারণাকেই আরো অনেকখানি বিস্তৃত করবে ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়। যেহেতু এখানে কেউ বিক্রেতা আর কেউ ক্রেতা নয়, সবাই কর্মী; তাই সবারই পূর্ণ সার্বভৌমত্ব এখানে থাকার কথা। একে কতকটা তুলনা করা যেতে পারে সেমিনারের সঙ্গে। সেমিনারে নিজেরা পড়াশুনা করে প্রস্তুত হয় সকল অংশগ্রহণকারী, সকলের সামনে নিজের জ্ঞান তুলে ধরে, সকলের সঙ্গে মত বিনিময় করে এবং ওভাবেই নূতন জ্ঞান লাভ করে। অবশ্য সেমিনারেরও একটি কর্তৃপক্ষ থাকে– যারা হলো সেমিনার ব্যবস্থাপক। আদর্শ ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থাপকের ভূমিকাও থাকা উচিত নয়। এখানেই ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টিতে বিলম্ব হবার একটি কারণ নিহিত। কারণ এ সংক্রান্ত যেসব সফ্‌টওয়্যার এখন তৈরি হচ্ছে তার অধিকাংশ সেমিনার-ধর্মী বটে, কিন্তু সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষের কাছে বিক্রয়ের জন্য তৈরি হচ্ছে। সফ্‌টওয়্যারগুলোর পরিকল্পনা করছেন সফটওয়্যার ব্যবস্থাপকরা আর তা তাঁরা করছেন বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপকদের জন্য। কাজেই তাঁরা অবশ্যম্ভাবীভাবে সেমিনার আয়োজনের ক্ষমতাটি রেখে দিচ্ছেন ব্যবস্থাপকদের হাতে। এখন এমন সফ্‌টওয়্যারের দরকার যার সাহায্যে ছাত্ররা নিজেরাই নিজেদের সেমিনার সৃষ্টি করতে পারবে। যে কোন কর্মীর যখনই প্রয়োজন বোধ হবে সে তখন নিজেই একটি সেমিনারের আহ্বান জানাতে পারবে। এগুলো এখনকার মতো তখনো হবে

'ইমেইল-আলোচনা' অথবা 'বুলেটিন বোর্ডের' আকারে। তাতে কাকে ওদের প্রয়োজন, কারা যোগ দেবে– তা উন্মুক্ত রাখার বা সীমাবদ্ধ করার ক্ষমতাও তাদের থাকবে। যদি তারা বিশেষজ্ঞকে বা 'শিক্ষককে' বাদ দিয়ে কিছু করতে চায়, তা হলে সেভাবেই তাদের সেমিনারের আয়োজন করতে পারবে।

পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের যোগ

ঐ 'সেমিনার ধর্মী' শিক্ষার প্রকৃতিও কিন্তু আরো বাস্তব-নিষ্ঠ হবে। এখন যে প্রযুক্তি রয়েছে তাতেই দিব্যি পরস্পরের দৃশ্য, শব্দ ইত্যাদি যোগ করে সত্যিকার কনফারেন্সের মত করে তোলা যায় একে। এখন শুধু এগুলোর সমন্বয়ে যোগ্য সফ্‌টওয়্যারের অপেক্ষা। এমন সফ্‌টওয়্যার শিগগির হয়তো পূর্ণ অংশগ্রহণমূলক একটি সেমিনারের সকল স্বাদ ভার্চুয়াল জগতে এনে দেবে– যেখানে ইন্টারেস্টিং কোন সদস্যের চারিদিকে অনেকের ভিড় করা থেকে শুরু করে, দু'জনের ফিসফিসানি আলাপ পর্যন্ত– সব রকম আমেজ ধারণ করা যাবে।

কেউ কেউ মনে করেন ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয় আদৌ কোনদিন জনপ্রিয়তা পাবে না কারণ ছাত্র-শিক্ষকের মুখোমুখি উপস্থিতি ছাড়া শিক্ষা হয় না। তাঁদের কাছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিটি এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমরা যদি সেই পাঁচটি অনুভূতির কথা বিবেচনা করিই, আসলে তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মাত্র দুটি– দৃশ্যমানতা এবং শ্রবণযোগ্যতা। ভার্চুয়াল পরিবেশে এই দুটিকে এখন বাস্তবের

সমান তো বটেই অনেক সময় বাস্তবের চেয়েও জজ্বল্যমান করে তোলা যাচ্ছে। আর বাকি থাকে গন্ধ, স্বাদ আর স্পর্শ। হ্যাঁ গন্ধ কোন কোন ক্ষেত্রে জরুরী হয়ে উঠতে পারে বটে, যেমন কেমিস্ট্রি বা এনাটমির চর্চায়। সে রকম অভিজ্ঞতাকে আমরা বছরের শেষে কয়েক সপ্তাহের একটি মুখোমুখি কর্মশালার জন্য আলাদা করে রাখতে পারি। ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়েও অল্প সময়ের জন্য এরকম বৈচিত্রের ব্যবস্থা তো হতেই পারে। আর যদি স্বাদ ও স্পর্শের কথা বিবেচনা করেন, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়েই বা তার স্থান তেমন কোথায়?

জ্ঞান-রিসোর্সের ও উদ্যোগের মালিকানা

আসলে মূল বিষয়টি হলো ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হবে একটি 'স্থানের' পরিবর্তে একটি কালচারে। স্থানের সীমানা যেমন এতে থাকবেনা, কালের সীমানাও লুপ্ত হয়ে যাবে অনেকটা। আজকাল জীবন-ব্যাপী শিক্ষা কথাটি খুব চালু হয়েছে। এটি এখনো একটি কথাই থেকে যাচ্ছে। ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বারের মত এর সত্যিকার সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে। এটি সম্ভব হবে শুধু ইন্টারনেটের বদৌলতে কোর্স-ম্যাটেরিয়াল আদান-প্রদানের অধিক সুযোগের জন্যই নয়। বরং এর কারণটি তার চেয়েও অনেক বেশি মৌলিক। এর মূলে রয়েছে জ্ঞানের যে রিসোর্স তার মালিকানা স্বত্বটি পরিবর্তনের মধ্যে।

এখন যিনি জ্ঞান সৃষ্টি করেন, যিনি বই লিখেন, তিনি এর মালিকানা অনেকাংশে প্রকাশকের হাতে সমর্পণ করে দেন। অধ্যাপক সেটি সমর্পন করেন যে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে চাকরী দিয়েছে তার হাতে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় তো নিজেই তার সব বইপত্র ও কোর্স ম্যাটেরিয়ালের মালিক হয়ে তা বিক্রয় করে। ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে সব কিছু অন লাইনে থাকছে বলে যারা প্রয়োজন মনে করবে সেখান থেকেই জ্ঞানের রিসোর্স কিনবে– সরাসরি লেখকের কাছ থেকে, কিংবা গবেষকের কাছ থেকে হলেই সব চেয়ে ভাল। উদাহরণ স্বরূপ লেখক তখন চাইতে পারেন তাঁর লেখাটি সর্বাঙ্গীন ভাবেই সরাসরি ছাত্রের কাছে যাক, খন্ডিত ও অনেক সময় বিকৃত হয়ে উপস্থাপক/ বক্তা / টিকা-ভাষ্যদানকারী অধ্যাপকের বয়ান হিসাবে নয়।

ছাত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা এতে থাকছে সারা দুনিয়া থেকে তার জ্ঞানের রিসোর্স সংগ্রহ করার। এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হবে ভবনের পরিবর্তে বিশ্বে, এবং বিশ্বের কারণে কালচারে। এ কালচার তাকে অনেক ক্ষমতা দেয়। নিজেই নিজের সেমিনার সৃষ্টি করার ক্ষমতা, সহপাঠি নির্বাচনের ক্ষমতা, নিজের শিক্ষার ভাল-মন্দ নির্ণয়ের ক্ষমতা, ইত্যাদি অনেক কিছু। সামনা সামনি সবার সঙ্গে দেখা না হলেও এখানে

ছাত্র মোটেই একা নয়, বরং আজকের বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক অনেক বেশি ভাবে সে প্রাসঙ্গিক সবার সঙ্গে সংযুক্ত হবে, যেই সংযোগ স্থান ও কালের অনেক সীমানাকে অনায়াসে অগ্রাহ্য করতে পারে। উদ্যোগটি এখানে মোটেই কোন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বা কোর্স প্রদানকারীর হাতে নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে ছাত্রের হাতে। শুরু থেকেই তাকে গবেষকের মনোভঙ্গী নিয়ে, অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমে শিক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। আসলে এটিই তো শিক্ষার আনন্দ। মনে হতে পারে ক্লাসে তার শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাত হবে না বলে, কিংবা টিউটরের পরামর্শ পাবেনা বলে সে নেহাৎ অসহায়, যেখানে বুঝছেনা সেখানে আটকে যেতে হবে তাকে। এটি কিন্তু একেবারেই হবেনা। পরামর্শের জন্যই শুধু নয়, অনুপ্রেরণার জন্য, দলীয় উৎসাহের জন্য সে এখন নির্ভর করতে পারে অনেক ব্যাপক একটি গোষ্ঠির উপর, তার শিক্ষক বা তার টিউটরের সীমবদ্ধতার মধ্যে আটকে না গিয়ে। আর বছরের শেষে কিছু দিন এমনি একটি অনুপ্রাণিত গোষ্ঠির সঙ্গে মিলে যদি সে প্র্যাকটিকাল কাজগুলো দলবদ্ধ ভাবে করতে পারে–গন্ধ, স্পর্শ সব কিছু ভাল ভাবে নিয়ে, তা হলে তো কোন কথাই নেই।

আর ওভাবে একত্র না হলে ছাত্র যে হাতে কলমে কিছুই করতে পারবেনা তাও কিন্তু ঠিক নয়। আজকের জ্ঞান বিজ্ঞানে অনেক পরীক্ষা নিরিক্ষা কিন্তু কম্পিউটার তথ্য, ডিজাইন, সিম্যুলেশনের মাধ্যমে অনেক ভাল ভাবে এবং অনেক কম খরচে করা সম্ভব। ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে সে রকম ভার্চুয়াল ল্যাবোরেটরীর কোন অভাব হবেনা। ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যা প্রচুর পরিমাণে লাগবে তা হলো ছাত্রদের প্রচুর উদ্যম আর উদ্যোগের। উদ্যম শুধু সরাসরি ইন্টারনেট থেকে জ্ঞান খুঁজে নেবার জন্যই লাগবেনা, মাঝে মাঝে কম্পিউটার ছেড়ে উন্মুক্ত পৃথিবীতে, বাইরে বেরিয়ে পড়ার নূতন কিছু অজুহাত তখন তাদের খুঁজে নিতে হবে। আমাদের সনাতন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদেরকে বাড়ি ছেড়ে নূতন জায়গায় বন্ধুদের সঙ্গে থাকার যে সুযোগটি আগে দিচ্ছিল তার একটি বিকল্প হিসাবে ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও কোন না কোন ভাবে বহির্গামী হতে হবে।

লেখক মুহাম্মদ ইব্রাহীম বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণে এবং বিজ্ঞান বিষয়ক লেখার ক্ষেত্রে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। ১৯৬০ সালে তিনি এদেশের প্রথম জনপ্রিয় বিজ্ঞান মাসিক *সাময়িকীর* প্রতিষ্ঠা করেন এর সম্পাদক হিসাবে। তাঁর সম্পাদনায় এ পত্রিকা এখনো প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞান সাময়িকী সহ বিভিন্ন মাধ্যমে তাঁর অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে, এবং তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের সংখ্যাও অনেক। নিজের বিষয় পদার্থবিদ্যার বাইরেও বিজ্ঞানের বিচিত্র শাখায় তাঁর লেখনীর স্বচ্ছন্দ গতি রয়েছে। বর্তমান বইটিও তার সাক্ষ্য বহন করে। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রে লেখালেখি ছাড়াও টেলিভিশন ও রেডিওর মাধ্যমে তিনি দীর্ঘকাল ধরে অবদান রেখে চলেছেন। দেশের একজন টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব হিসাবেও তিনি সুপরিচিত। ১৯৭৮ সালে অনুরূপ উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (সিএমইএস) নামক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, নিজে কর্ণধার থেকে যাকে তিনি দেশব্যাপী মাঠপর্যায়ে কাজের একটি বড় ও সুযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন।

ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক।

প্রচ্ছদ : উত্তম সেন

ISBN 984410503-X
9 799844 105033